# সাহিত্য পত্রিকা

**এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ**

**আষাঢ়-অগ্রহায়ন, ১৪১৬ / জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৯**

## সম্পাদক

ড. রিটা আশরাফ

**এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস**

**সম্পাদক**

ড. রিটা আশরাফ

**সম্পাদনা পরিষদ**

এস. এম. গাজিউর রহমান
ড. কামরুল আহসান
ড. সৈয়দা মোতাহেরা বানু
খন্দকার আবদুল মোমেন
ড. রিটা আশরাফ

**প্রকাশক**

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
বাড়ী ৯, সড়ক ৫, সেক্টর ৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
ফোন ঃ ৮৯৫০৭৩২-৩৫; ৮৯১৬১১৬, ৮৯১২৩৬৬, ৮৯২২৯৯২-২২১, ১১২ ফ্যাক্স ঃ ৮৯৫৮৬০৩
মোবাইল-০১৫৫৬৩৪২৭৭০

**প্রচ্ছদ**

ফরিদী নুমান

**মুদ্রক**

মেভিস প্রিন্টার্স
১৪৫, আরামবাগ, ঢাকা

**মূল্য**-পঞ্চাশ টাকা/ টঝ৳ ৫

**বিঃ দ্রঃ** সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের নিজস্ব।

---

ঝযধযরঃঃড় চধঃৎরশধ, ধ নর-ধহহঁধষ ষরঃবৎধৎু সধমধুরহব ড়ভ অংরধহ টহরাবৎংরঃু ড়ভ ইধহমষধফবংয, বফরঃবফ নু উৎ. জরঃধ অংযৎধভ ধহফ ঢ়ঁনষরংযবফ নু অংরধহ টহরাবৎংরঃু
চৎবংং, ঐড়ঁংব-৯, জড়ধফ-৫, ঝবপঃড়ৎ-৭, টঃঃধৎধ গড়ফবষ ঞড়হি, উযধশধ-১২৩০.
চযড়হব: ৮৯৫০৭৩২-৩৫; ৮৯১৬১১৬, ৮৯১২৩৬৬, ৮৯২২৯৯২-২২১, ১১২ ঋধী: ৮৯৫৮৬০৩
গড়নরষব-০১৫৫৬৩৪২৭৭০
উ-সধরষ : ংযধযরঃঃড়ঢ়ধঃৎরশধ@ধঁন-নফ.ড়ৎম
ডবনংরঃব: িি.ধঁন-নফ.ড়ৎম/ংযধযরঃঃড়ঢ়ধঃৎরশধ./যঃসষ

## প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

## উপদেষ্টা পরিষদ

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

ড. আশরাফ সিদ্দিকী

ড. সফিউদ্দিন আহমদ

আল মাহমুদ

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

## সম্পাদকীয়

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর সাহিত্য পত্রিকার ২য় সংখ্যাটিও স্বমহিমা নিয়ে প্রকাশিত হলো। এমনিভাবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হয়তো একদিন এটি গৌরবান্বিত পদভারে বছর পূর্তি এমন কি যুগ পূর্তি উৎসবও পালন করবে। আমি দৃঢ় আশা রাখি-করবেই। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ তার সফলতার উজ্জ্বল মহিমায় ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়ে যুগ পূর্তি পালন করেছে, সুতরাং এটি তো তারই দেহের অংশ, আত্মার বন্ধন। এটিও করবে।

খুবই আনন্দ লাগছে এই জন্য যে, একটি সাহিত্য পত্রিকা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত প্রকাশনার ক্ষেত্রে কত প্রয়োজন, শিক্ষার্থীদের প্রতিভা প্রকাশের কত বড় মাধ্যম–এটি জেনে। প্রতিদিনই শিক্ষার্থী, এইউবি পরিবারের নানা স্তরের সদস্যগণ জানতে চান "ম্যাডাম পত্রিকা বের হচ্ছে কবে, আমার লেখাটি থাকছে তো"।

ডাকে প্রায় প্রতিদিনই অতিথি লেখকদের লেখা পাচ্ছি। পত্রিকা সম্পর্কে পাঠক সমালোচনা পাচ্ছি। খুবই আনন্দ লাগছে। অর্থাৎ সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা পেরিয়ে বাইরেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। আর সেই সাথে নিজের সুনামও কুড়িয়ে এনেছে।

যে বিষয়টি পূনর্ব্যক্ত করছি সেটি হচ্ছে, এটি সাহিত্য পত্রিকা। নিটোল সাহিত্য পত্রিকা। আমি মনে করি, একজন সাহিত্যিকের রচিত সাহিত্য কখনো ডান কিংবা বাম রাজনীতি বা মানসিকতায় সম্পৃক্ত নয়। পাঠকবৃন্দও সকল লেখাকে সেভাবেই গ্রহণ করবেন। এই পত্রিকা সবার। এটি মুক্তবুদ্ধি চর্চার নিরপেক্ষ বাহন। সব মানসিকতা সম্পন্নদের জন্য উন্মুক্ত।

পাঠক মতামতের উপর ভিত্তি করে এ সংখ্যা থেকে নিয়মিত সব লেখার সাথে আরও দু'টি বিষয় নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে। বিষয় দু'টি হলো পাঠক সমালোচনা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংবাদ।

আরও একটি কথার পুনরাবৃত্তি। আমরা কেউই সম্পূর্ণ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। কাজেই অত্যন্ত নির্ভুল একটি পত্রিকা পাঠকদেরকে উপহার দেয়ার আন্তরিক চেষ্টা আমি করেছি। তারপরও অজানিত কোন ভুল-ত্রুটি উপস্থাপিত হলে সেটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল এবং পাঠকদের কাছে পত্রিকার যে কোন আঙ্গিক থেকে সমালোচনাসহ পত্রিকার মান উন্নয়ন সম্পর্কে সম্পাদকের নিকট মতামত প্রেরণের অনুরোধ জানানো হলো।

**ড. রিটা আশরাফ**

সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকা
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

# দ্বিতীয় সংখ্যার অতিথি লেখক

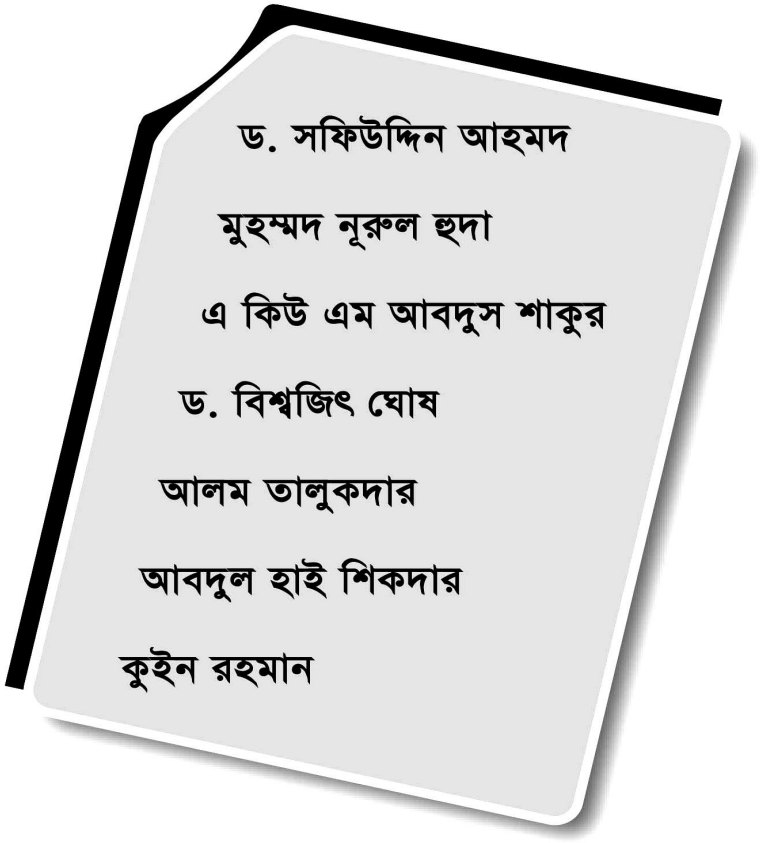

## সূচিপত্র

### বিশেষ রচনা

সাহিত্যের সব্যসাচী আলাউদ্দীন আল আজাদ * ড. সফিউদ্দিন আহমদ *

### সাক্ষাৎকার

জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী * সাক্ষাৎকার গ্রহণ-রিটা আশরাফ *

### ভ্রমন কাহিনী

হিজাব * এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার *

### প্রবন্ধ

সুফিয়া কামালের কবিতায় নারী ভাবনা ও জেন্ডার চেতনা * ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ *
নারী শিক্ষা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ * প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম মল্লিক *
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিশুসাহিত্য * ড. সৈয়দা মোতাহেরা বানু *
যুগ বিবর্তনে আজকের বাংলা সাহিত্য * নাসীমুল বারি *
সিরাজগঞ্জের লোকনাট্য * কুইন রহমান *

### গল্পগুচ্ছ

টুকরো টুকরো ক্রিকেট * আবদুল হাই শিকদার *
মিলেনিয়াম-২০০০ * রিটা আশরাফ *
আলোর অন্তিমতা * মুহাম্মদ লাভলু সরকার *
যখন ভুল ভাঙলো * ইন্দিরা হক *
বাসযাত্রী আশফাক * ফারহানা তাজকিয়া *
একটি লাশের সাক্ষাৎকার * রবিউল আলম ফিরোজ *
স্বপ্নঘোর * মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম *

### রম্যরচনা

একটি বোকা ছেলের গল্প * মোঃ মঈদুল ইসলাম *

### কবিতাগুচ্ছ

মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতা *
রক্ত ধরণী * আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক *
অনেক ফুল শুকিয়ে যায় * আলম তালুকদার
তোমার কবিতায় আমার প্রাণ * প্রফেসর কামাল আতাউর রহমান *
ভ্রাতৃত্ব* * মোঃ জাকির হোসাইন *

লক্ষী বউ * জাহানারা তালুকদার *
নদী এখন শুধুই স্মৃতি * মুহাম্মদ কবির *
আমারে পড়ান স্যার * ইন্দিরা হক *
অভিসারে * মোঃ ফজলুল হক আকাশ *
বিরহ বেলা * মাহমুদ পারভীন (পুষ্প) *
লাল সবুজের পতাকা * উম্মে কুলসুম *
শরতে * রওনক জাহান *
আমার ইচ্ছে করে * রাহাত ইসলাম *
বাস্তব * মোঃ ফিরোজ হোসেন রিতু *
ব্যবধান * -মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম *
ভাগ্যের খেলা * মোঃ নজরুল ইসলাম *
তুমি আমার কবিতা * শহিদুল ইসলাম রনি *
অনাস্থা জ্ঞাপন * ইরাজ ইকবাল *
সৌন্দর্য * এস ডাবলু সজল *
কষ্ট * জি কে অভি *
এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় * মোঃ গাজী পিয়ার আহম্মেদ *

**কাব্যগাঁথা**

তুমি নও ট্রয়ের হেলেন * এস. এম. গাজীউর রহমান *

**অনুবাদ কবিতা**

ভালবাসার কথা বলতে যেওনা কখনো * মোঃ শফিউল আজম *

**ফিরে দেখা**

ভিক্টোরীয় যুগের ব্রন্টি পরিবার * সালমা পারভীন *

**ফিচার**

আমি এবং আমার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি * জে সি ফুলকুমার*
গ্রন্থাগার জ্ঞানে সঞ্চয়িনী * মুহাম্মদ জুবায়ের রহমান চৌধুরী

**পাঠক মতামত**

ড. রহমান হাবিব * মোঃ শফিউল আজম (মাহফুজ) * সাদিয়া ফারজানা মোস্তাফিজ (উর্মি)*

**গ্রন্থ আলোচনা**

রবীন্দ্রনাথের পজিটিভ বিশ্বাসের জগৎ * সৈয়দ সাইফুল ইসলাম *

**সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংবাদ** *

বিশেষ
রচনা

**একজন প্রগতিশীল লেখক হিসেবে আমার কৈশোরে আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন আমার এক সম্মোহক ব্যক্তিত্ব। বামপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য অধ্যাপনা জীবনের প্রথমে তিনি কারা-বরণ করেছেন। আমার কাছে তখন এটিও ছিলো এক বিস্ময়।**

## ড. সফিউদ্দিন আহমদ

# সাহিত্যের সব্যসাচী
# আলাউদ্দিন আল আজাদ

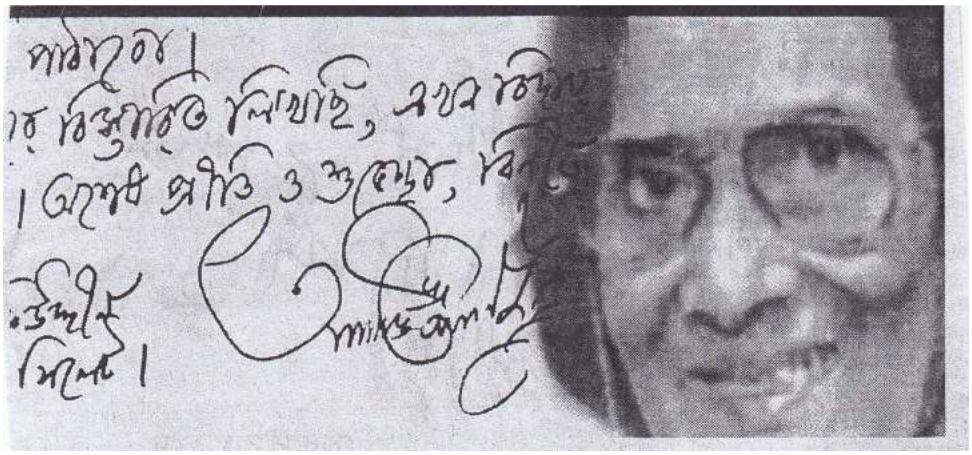

*[ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন গত ৪ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখে। পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ চলে গিয়েও বেঁচে থাকেন যুগ যুগ ধরে তাঁদের মহিমাময় কীর্তির দ্বারা। ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলা সাহিত্যের জগতে তাদের মাঝে একজন। সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তাঁর কলমের ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ হয়নি। আমাদের জন্য তিনি যা রেখে গেছেন তা দিয়ে আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম আলোর পথের সন্ধান পাবে। এই প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার রামনগর গ্রামে ১৯৩২ সালের ৬ মে। আমাদের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি সাহিত্য পত্রিকার উপদেষ্টা পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন তিনি। এই মহান কীর্তিমান লেখকের প্রতি আমাদের সাহিত্য পত্রিকা তথা এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানাই গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁকে নিয়ে আমাদের সাহিত্য পত্রিকার জন্য বিশেষ রচনাটি লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের আরেক সব্যসাচী লেখক ড. সফিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকা)।]*

কৃতী সন্তানের উজ্জ্বলভূমি, রত্ন সন্তানের রত্নভূমি রায়পুরা। সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা এবং দেশপ্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবদীপ্ত ভূমিকায় এর কৃতী সন্তানেরা শুধু দেশে নয় বহির্বিশ্বেও নন্দিত এবং পরিচিত।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পুরোধায় সাহিত্যের সব্যসাচী আলাউদ্দিন আল আজাদ, প্রধানতম কবি শামসুর রাহমান, ভাষাবিজ্ঞানী মনিরুজ্জামান এবং বিশ্বনন্দিত শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমদ এ রত্নভূমিকে তাদের সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে মহিমান্বিত করেছেন। আমার বাড়ি রায়পুরা সদরে। চারদিক থেকে তাদের ঔজ্জ্বল্যে আমি নিজেও উজ্জ্বল এবং গৌরবান্বিত।

একজন প্রগতিশীল লেখক হিসেবে আমার কৈশোরে আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন আমার এক সম্মোহক ব্যক্তিত্ব। বামপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য অধ্যাপনা জীবনের প্রথমে তিনি কারা-বরণ করেছেন। আমার কাছে তখন এটিও ছিলো এক বিস্ময়।

বামপন্থী লেখক হিসেবে আলাউদ্দিন আল আজাদ তখন সকলের কাছেই এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর জেগে আছি, আমপাতা-জামপাতা, ধানকন্যা, মৃগনাভি সে সময় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

বামপন্থী কর্মতৎপরতা এবং প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আলাউদ্দিন আল আজাদের সাহসী ভূমিকা আজ অনেকেই ভুলে গেছে - কিন্তু সেদিন রণেশদাশ গুপ্ত, সোমেন চন্দ, আলাউদ্দিন আল আজাদ,সরদার ফজলুল করিম ও মুনীর চৌধুরী ছিলেন অনন্য। মার্কস ও ফ্রয়েডীয় দর্শনের অপূর্ব শৈল্পিক সমন্বয় ঘটেছিলো আলাউদ্দিন আল আজাদের লেখায়। তখন অনেকেই তাঁকে বাংলাদেশের মানিক বন্দোপাধ্যায় বলতো। আলাউদ্দিন আল আজাদ, কবি শামসুর রাহমান, ড. মনিরুজ্জামান, শিল্পী শাহাবুদ্দিন ও খোরশেদ আলম (প্রাক্তন সচিব) আমরা একই এলাকার মানুষ এবং ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন আমরা।

ড. মনিরুজ্জামান ও শিল্পী শাহাবুদ্দিন ছাড়া সকলেই আমার দশ বছরের বড়ো। কিন্তু তারা সকলেই আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করেন। এ নিয়ে আমি একদিন ড. আজাদ ও খোরশেদ ভাইকে বলেছি "আপনারা আমার অনেক বড়ো, আমাকে আপনারা সফিভাই সম্বোধন করেন কেনো?" উত্তরটা দিলেন খোরশেদ ভাই'ই। বললেন, "আপনার লেখা, আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্বের জন্যই 'সফিভাই' বলি"।

একদিন ড. আজাদকে বললাম, আপনি ছিলেন খ্যাতির তুঙ্গে, সাহিত্যিক হিসেবে আপনার সাথে তুলনা করার মতো কেউ ছিলোনা। কিন্তু আপনি বেঁচে থাকতেই আপনার সম্বন্ধে কেমন যেনো একটা নির্লিপ্ত ও শীতল মানসিকতা, কারণ কী! তিনি অনেকক্ষণ নিরব হয়ে থাকলেন; এরপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন "আমি বোধহয় মোহের কাছে, জীবনের কাছে হেরে গেছি"।

ঢাকা ও সিলেটে বহুবার আমার বাসায় তাঁর আনন্দময় উপস্থিতি ঘটেছে। তাঁর একটা অভিমান ছিলো তাকে নিয়ে কেউ লিখেনা। এ বিষয়ে তাগিদ দিয়ে আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন। অনেক আগের একটি চিঠি-

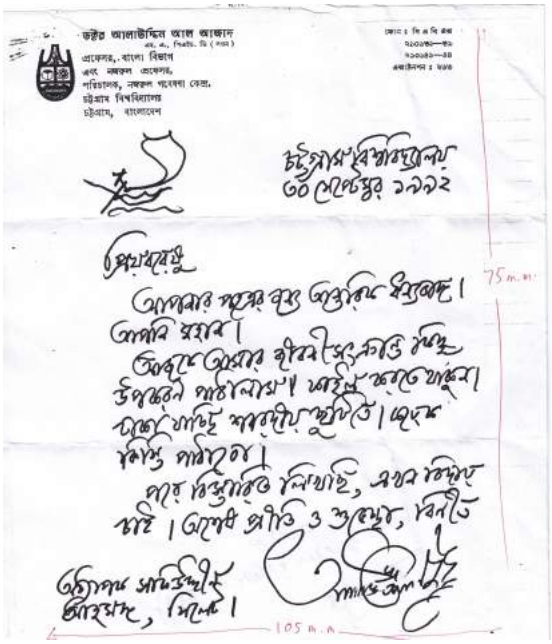

দুঃখের বিষয় তাঁকে নিয়ে আমি লিখিনি। অথচ ড. আব্দুল হাই সিদ্দিক ও প্রফেসর শাহ মোঃ হালিমুজ্জামান আমাকে জানালেন পরলোকের পরোয়ানা পেয়ে তিনি চলে গেছেন। কেনো লিখিনি এজন্য আজ তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে নিজকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।

সিলেটে কয়েকবারই তিনি আমার বাসায় গিয়েছেন। আমার ছেলেমেয়েদের সাথে আসর জমিয়েছেন। তাদের খাতায় দু'চার লাইন লিখেও দিয়েছেন।

আমি বারবারই অন্তর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করেছি তাঁর ওপর কিছু লেখার জন্য কিন্তু কেনো যে লেখা হয়নি তাও বুঝে ওঠতে পারিনি। ২০০৫ সালে শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে ঢাকায় আমার ফ্লাটে চলে আসি। ভাবছি এবার কিছু লিখবো কিন্তু গুছিয়ে ওঠতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয় কোয়াটার্স হতে আমার বইপুস্তক কিছু রায়পুরা আর কিছু ঢাকার বাসায়– আর এক বিশৃংখলায় পড়ে গেলাম। এরই মধ্যে আমার হয়ে গেলো বাইপাস সার্জারি। এভাবে তাঁর ওপর কিছু লিখবো করে করে আর লেখা হয়নি। দুঃখ এখন তিনি সব কিছুর উর্ধে চলে গেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ তার প্রকৃত নাম নয়। 'আল আজাদ' প্রকৃত নামের সাথে যোজিত লেখক নাম। তাঁর জন্ম ১৯৩২ খ্রিঃ ৬ মে (বাংলা ১৩৩৯ সালের ২২ বৈশাখ) বৃহত্তর ঢাকার বর্তমানে নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার রামনগর গ্রামে। পিতা আব্দুস সোবহান, মাতা মোসাম্মৎ আমেনা খাতুন। এক বছরের বয়সে মাকে

এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় বাবাকে হারান। আর এখান থেকেই শুরু হয় তার জীবন সংগ্রাম।

মা-বাবাকে হারানোর পর দাদী তাকে লালন পালন করতেন। গ্রামজীবনের কৃষিভিত্তিক পরিবার। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকারই কথা। একবার আমার বাসায় একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। দাদীর ভয়ানক অসুখ। আর্থিক অনটনের জন্য ভালো ডাক্তার দেখাতে পারছেন না। রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার হিসেবে তিনি যে গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন মাত্র সাতটাকায় ঐ মেডেল বিক্রি করে ভৈরব থেকে যখন ডাক্তার নিয়ে বাড়িতে এলেন তখন দাদী চির বিদায় নিয়েছেন। মেট্রিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগ পেয়েছেন। তার প্রবল ইচ্ছে ঢাকা কলেজে পড়বেন কিন্তু বাড়ি থেকে পা ফেলার আর্থিক সঙ্গতি নেই। শেষ পর্যন্ত গ্রামের একজনের কাছ থেকে তিন টাকা হাওলাত করে দৌলতকান্দি রেলস্টেশন থেকে এক টাকায় ঢাকার টিকেট কিনে ঢাকায় যাত্রা করেন। সাথে দু'টাকা আর ছোট্ট একটি টিনের সুটকেস। তবে এ যাত্রায় তিনি জানতেন না ঢাকায় কোথায় ওঠবেন এবং ঢাকা কলেজে ভর্তির টাকা কোথায় পাবেন। ঢাকা ফুলপুর রেলস্টেশনে নেমে হতভম্ব- এরপর কোথায় যাবেন? তাঁর মাথায় অনন্ত চিন্তা–কোথায় উঠবেন এবং অন্নসংস্থান ও ভর্তির চিন্তা। এবার শুরু হলো তাঁর জীবনের প্রকৃত সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় মিললো পুরান ঢাকার ঘোড়ার গাড়িওয়ালার আস্তাবলের পার্টিশন দেয়া অর্ধেক অংশে। এখান থেকেই তাঁর ঢাকার জীবন ও ঢাকা কলেজে পড়া শুরু।

নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই কোলকাতার সওগাত পত্রিকায় (১৯৪৬) আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম প্রবন্ধ 'আবেগ' ও ছোটগল্প 'জানোয়ার' প্রকাশিত হয় এবং তখন তিনি নারায়ণপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র। ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় তাঁর গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয় (১৯৫০)।

ঢাকায় অবস্থানের কয়েকদিনের মধ্যেই শামসুর রাহমান ও হাসান হাফিজুর রহমানের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। পুরান ঢাকায় একটি মেসে তারা চুটিয়ে আড্ডা দিতেন। আমার কলেজ জীবন থেকেই এ তিনজনের সাথে আমারও একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল হাই স্যারের বারো বছর পর বাংলা অনার্সে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন (১৯৫৩) এবং এম. এ. পরীক্ষায়ও একই ফলাফল করেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদের পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'খরভব ধহফ ংযড়ৎঃ-ঢ়ড়বসং ড়ভ ওংযধিৎপযধহফৎধ মঁঢ়ঃধ্ব.লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই গবেষণা করেছেন। তাঁর এই বহু বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ও যুব আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এবং সবগুলো গণআন্দোলন ও মিছিলে সংযুক্ত থাকতেন।

ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র-ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও বার্ষিকী সম্পাদক ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে ড. আজাদ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন এবং শহীদ মিনার নিয়ে তিনি প্রথম কবিতা লিখেছেন। তাঁর রচিত পংক্তিমালা আমাদের রক্ত কণিকার স্পন্দনে স্বত উচ্চারিত হয়-

স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু
আমরা এখনো চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো।

সেদিনকার পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ও লেখক শিল্পী মজলিসের সম্পাদক ছিলেন ড. আজাদ। এ সব ছাড়াও ঢাকা জেলা যুবলীগের সভাপতি ও প্রাদেশিক যুবলীগের সহসভাপতি ছিলেন। পরে ড. আজাদ বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রথম জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৫৪) অন্যতম সংগঠক ছিলেন। প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য দু'দুবার তিনি কারাবরণ করেছিলেন। তখনকার দিনে একজন নিষ্ঠাবান বামপন্থী হিসেবে তিনি সকলের কাছে সৎ ও সাহসী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের লেকচারার হিসেবে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের শুরু। এরপর জগন্নাথ কলেজ, মুরারিচাঁদ কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। মাঝে মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে প্রায় ছয় বছর ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তিনি সংস্কৃতি উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ সাহিত্যের সব্যসাচী। সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর হাতের যাদুস্পর্শী পরশ রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা উপস্থাপন করছি-

১। ছোটগল্প

জেগে আছি, ধান কন্যা, মৃগনাভী, অন্ধকার সিঁড়ি, উজান তরঙ্গে যখন সৈকত, আমার রক্ত স্বপ্ন আনার, দূরযাত্রা, আমাকে একটা ফুল দাও, আষাঢ়ে শ্রাবণে, নির্ধারিত গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প।

২। উপন্যাস

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন, কর্ণফুলি, ক্ষুধা ও আশা, খসড়া কাগজ, শ্যামল ছায়ার সংবাদ, জ্যোৎস্নার অজানা জীবন, সকল ফসল, ন্যাংটা চাঁদের নীচে, পাটরাণী, গাছ-গাছালির আওয়াজ, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, অপর যোদ্ধারা, পুরানা পল্টন।

৩। কবিতা

মানচিত্র, ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ, সূর্যজ্বালার সোপান, লেলিহান পাণ্ডুলিপি, নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ, আমি যখন আসবো।

৪। নাটক
ধন্যবাদ, মায়াবী প্রহর, মরক্কোর জাদুঘর, ইহুদির মেয়ে, নি:শব্দ যাত্রা, নরকে লাল গোলাপ, সংবাদ শেষাংশ, হে সুন্দর জাহান্নাম।

৫। প্রবন্ধ

শিল্পীর সাধনা, সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু, রবীন্দ্র ক্লাসিক আবিষ্কার, সমকালীন সাহিত্য, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক রূপান্তর ও তার পরিমাপ।

৬। গবেষণা
ঈশ্বর গুপ্ত, মায়াকভস্কি, নজরুল।

৭। ডায়েরি
ফেরারী ডায়েরী।

৮। শিশু সাহিত্য
জলহস্তী (উপন্যাস), আরেক ঠিকানা (উপন্যাস), জন্মভূমি (কবিতা)।

**নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-**

আমার প্রথম লেখা ছাপার অক্ষরে 'নিমন্ত্রণ'- একটি পত্র। তেতাল্লিশের বাংলার মহাদুর্ভিক্ষের পর-পর স্বপন বুড়োকে সম্বোধন করে লিখেছিলাম এবং কোলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকার ছোটদের পাততাড়ি বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম রীতিমত সাহিত্যিক রচনা 'আবেগ'- একটি রীতিমত প্রবন্ধ। মাসিক সওগাত পত্রিকায় যখন মুদ্রিত হয় তখন আমি নারায়ণপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে উঠেছি (১৯৪৬)। এক সংখ্যা পর সওগাতে প্রকাশিত হয় আমার প্রথম ছোটগল্প 'জানোয়ার'। ভৈরব বাজারের রাস্তায় চাকুম্‌চুকুম্ চিক্‌চাক্ শব্দ করে হাঁটতে দেখতাম এক ন্যাংটা পাগলকে, আমার কিশোর চোখে অদ্ভুত লাগত- তাকে কেন্দ্র করেই গল্পটি লিখেছিলাম।

ড. আজাদের প্রথম গল্পগ্রন্থ "জেগে আছি" প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য-

প্রশ্ন: 'জেগে আছি' যখন আপনার প্রথম গল্পগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয় তখন বিদগ্ধ পাঠক মহলে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে, এই আলোড়নকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করে?

উত্তর: 'জেগে আছি' আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ উনিশ শ' পঞ্চাশ (১৯৫০) সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয় এবং উভয় বাংলার সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্যযুগ পত্রিকায় শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'জেগে আছি' মুসলিম

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ এবং সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা বই। ঢাকার আব্দুল গণী হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী সম্পাদিত 'মুক্তি' সাহিত্যপত্রে সুদীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার সমালোচনা প্রকাশিত হয় এবং তাতে মত প্রকাশ করা হয় 'এখান থেকেই আমাদের যাত্রা হল শুরু'। যদিও পাঁচ বছর বয়স থেকেই লিখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু সতের বছর বয়সে সাহিত্য জগতের এ রকম প্রতিষ্ঠা লাভের ঘন্টাধ্বনি আমাকে বেশ আলোড়িত করেছিল। কিন্তু তখনই আমার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে নিদারুণ ভাবে সচেতন হয়েছিলাম: তখন সাহিত্য আমার কাছে ছিল যেন ললিতকলার কোনদিক নয় জীবনেরই অন্য নাম। 'জেগে আছি'র গল্পগুলোতে সেজন্য বলিষ্ঠ বক্তব্য ও সামাজিক দ্বন্দ্ববাদের স্বত:স্ফুর্ত প্রকাশের স্বাক্ষর রয়েছে। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বিদগ্ধ শৈল্পিক নিপুণতার ঐতিহ্য থেকে এ কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। যার মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল যুবমানস ও গণসমাজের মুক্তি চেতনার উজ্জ্বলতা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমার মনে হয়, ছোটগল্পের আঙ্গিক ও কলাকৌশলগত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও 'জেগে আছি' বইটির উপরোক্ত স্বীকৃতি ও প্রশংসা একটা নবউদ্ভিদ্যমান সামাজিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সাহিত্যের উৎসমুখ নির্দেশ হিসেবে এটা প্রায় যথার্থ ছিল।

ড. আজাদের সমস্ত লেখা আমি আলোচনা করবো না। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে তাঁর 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসটি উল্লেখ করবো। কাঠামোগতভাবে একে নিখুঁত উপন্যাস বলা যায় না কিন্তু আমরা যখন বলি আজকের উপন্যাস কাহিনীও নয়-চরিত্রও নয়, মনন বিশ্লেষণ, মানবমনের অন্তর্লীন রহস্যের চিত্র উন্মোচন। এবং আজকের উপন্যাস যেনো আধুনিক কবিতার মতোই প্রতীক, রূপক ও ইঙ্গিতময়। একজন মনস্তত্ত্ববিদ যেমন তন্ন তন্ন করে মনোবিশ্লেষণ করেন আজকের ঔপন্যাসিকও তাই করেন। এখানে সমস্যা আছে, জটিলতা আছে কিন্তু সমাধান নেই। অন্য মাত্রিকতায় বলা যায় আজকের উপন্যাসে ঘটনা নয় জীবনকে চাই, মানব মনের ও জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের ক্ষতবিক্ষত ও রক্তক্ষরিত চিত্র দেখতে চাই অর্থাৎ বস্তু নয় লেখকের মনকে চাই- গল্প নয় জীবনের রহস্যকে জানতে চাই।

উপর্যুক্ত অভিধাগুলো নিয়েই আলাউদ্দিন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' একটি মহৎ উপন্যাস, একটি মহৎ কাব্য, একটি মহৎ চিত্র। মূলত: একজন শিল্পীর শিল্পকর্ম তার জীবন থেকেই নেয়া। এখানেই একজন শিল্পী একজন ঔপন্যাসিক জীবন শিল্পী। 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' রচনাকালে আলাউদ্দিন আল আজাদের বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। আমাদের অবাক করে এ বয়সে তিনি কী করে মানব মনের এই জটিল আবর্তের স্তরগুলো উন্মোচনে সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন!

তা'হলে কি আমাদের ভাবতে হবে যে, আঠারো থেকে ছাব্বিশ সাহিত্য রচনার একটি বিশেষ উৎকর্ষের কাল! ডিরোজিও, র‍্যাঁবো, কিটস, সুকান্ত, মোমেন চন্দ এই কাল রেখারই এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ড. আজাদের লেখায় আছে প্রেম ও বিদ্রোহ, প্রেম ও সুন্দর, বিপ্লব ও সমাজ পরিবর্তন, সত্য ও কল্যাণ, মানব মনের অন্তর্লীন রহস্যের চিত্র তিনি উন্মোচন করতে পেরেছেন। তার কোন কোন লেখা দেশ ও কালের সীমানার বৃত্ত ভেঙ্গে বৈশ্বিক আবেদনে ভাস্বর। 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' ইংরেজি, হিন্দি, রুশ, উর্দু, জার্মানি ও বুলগেরিয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বৃষ্টি গল্পটিও বিশ্বের কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বিশ্বের কয়েকটি শ্রেষ্ট কল্পের মধ্যে 'বৃষ্টি' একটি।

কবি শামসুর রাহমান একবার অভিমান করে আমাকে বলেছিলেন যে, আমাদের রায়পুরাতে অনেক বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও গবেষক আছেন, সমস্ত বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন স্পর্দ্ধাও করতে পারেন কিন্তু সকলের মধ্যে একটা যোজনা ও সম্পৃক্ততা নেই।

এই যোজনা ও সম্পৃক্ততার জন্য 'নরসিংদী-গাজীপুর' গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে। খুবই জাকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলাম আমি। সংবর্ধিতদের মধ্যে প্রথমেই ছিলো ড. আলাউদ্দিন আল আজাদের নাম। কিন্তু তিনি অনুষ্ঠানে আসেন নি। খোরশেদ আলম সাহেব (প্রাক্তন সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ও আজাদ স্যারের স্ত্রীর বড়ো ভাই) বললেন পায়ে ব্যথা। শেষ পর্যন্ত তিনি রয়ে গেলেন নেপথ্যেই।

ভিক্টর হুগো বলেছেন-

'গোণা কয়েকটি দিন মাত্র আমাদের আয়ু। এই দিনগুলি যেন নীচতলার দুর্বৃত্তদের পায়ের তলায় গুড়ি মেরে না কাটাই'।
একজন মহৎ শিল্পীর, প্রগতিশীল শিল্পীর এরচেয়ে বড়ো আদর্শ ও উচ্চারণ আর কী হতে পারে!

শিল্পীর মৃত্যু হয় বিভিন্ন কারণে। যেমন,

১. দেশ, সমাজ ও মানুষের প্রতি অঙ্গীকার বা দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাওয়া।

২. আদর্শে বিচ্যুতি ঘটা।

৩. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা ও প্রলোভনের মোহের কাছে আত্মসমর্পণ করলে।

এরই ফলে দেখা যায় কোন কোন শিল্পী কেউটে হয়ে মাথা তুলে যাত্রা শুরু করেও আবার আদর্শচ্যুত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঢুরাসাপ হয়ে বিবরে আশ্রয় নেয়। শিল্পীর এ মৃত্যুই হলো অপমৃত্যু।

ড. আজাদের একটি বড়ো দুঃখ ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যাপনায় যোগদান করতে না পারা। মাঝে মাঝে তিনি এ নিয়ে আমার সাথে খুব হতাশা প্রকাশ

করতেন। আমি এমনও শুনেছি যে, সরদার ফজলুল করিম ও আলাউদ্দিন আল আজাদ জেল থেকে মুক্তি পাবার সময় সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সমস্ত যোগ্যতা তাঁর ছিলো- কিন্তু কেনো তাঁর চাকরি হয়নি এ বিষয়ে তিনি আমাকে কিছু বলেননি- আমিও ইচ্ছে করে কিছু জানতে চাইনি।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার গর্ব যে, মুনীর চৌধুরী ও আহমদ শরীফ স্যারের ক্লাসই শুধু করিনি অনার্স এবং এম. এ- এর চার বছর এই দুই মহান শিক্ষকের অনুশীলনী বিভাগেও ছিলাম। তাছাড়া আদর্শিক কারণেও এই দুই মহান শিক্ষকের সাথে আমার একটা গভীর সম্পর্ক ছিলো। আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও আমি তাদের সাথে আলোচনা করতাম।

একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের পদে বিজ্ঞপ্তি হলো। আমি শরীফ স্যারের ১৮ সি ফুলার রোডের বাসায় গিয়ে এ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলাম। এক পর্যায়ে স্যার বললেন, যে কারণে তোমার এলাকাবাসী আলাউদ্দিন আল আজাদের এখানে চাকরি হয়নি একই কারণে তোমারও হবেনা।

স্যারের কাছে আর এর কারণ নিয়ে কোন কথা বলিনি। তবে আমি এতোটুকু বুঝেছি এবং জীবনের এই প্রান্তিক পর্বেও বিশ্বাস করি একজন মার্কসবাদী কখনো হতাশ হয়না এবং লাভ লোভ ও প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। তার সামনে দু'টি পথই উন্মুক্ত-

১. একজন বিপ্লবীর জীবন সেতো বিষের পেয়ালা। পান করতেই হবে, গত্যন্তর নেই।

২. জনগণের মুক্তির জন্য জীবন অথবা মৃত্যু, রক্তাক্ত সংগ্রাম অথবা অবলুপ্তির পথ ছাড়া পথ নেই।

যাক, ড. আজাদ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সরকারি চাকরিতে (অধ্যাপনায়, মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট) যোগদান করলেন আর আমি সরকারি কলেজের অধ্যাপনা থেকে শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করি (১৯৯১)।

শোনা যায় ড. আজাদের সরকারি কলেজে অধ্যাপনা বিষয়ে অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই সাহেবের মুখ্য ভূমিকা ছিলো। আমি একবার তাঁকে বলেছি হাই স্যার আপনাকে সরকারি কলেজে চাকরি দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিলেন না কেনো? মুনীর স্যারকে তো নিলেন। আমরা দু'জনই তখন রিকসায় ধানমণ্ডির পথে- কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি নিরুত্তর ছিলেন। বুকফাটা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন শুধু। তবে

সরকারি (অধ্যাপনা ও আমলা) কলেজ থেকেই তাঁর জীবনে যে অবরোহ বা আরোহের পর্ব শুরু হয়েছে এ অতীব স্পষ্ট।

ড. আজাদের আদর্শিক এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। কিন্তু এ দু'জনের মধ্যেও কী ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিলো? টিউটারিয়েল ক্লাসে মুনীর স্যার সুযোগ পেলেই শামসুর রাহমান, ড. আজাদের কথা তুলতেন। স্যার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ড. আজাদের কবিতাও আবৃত্তি করতেন। মনে পড়ে একবার বাংলা একাডেমীর একটা অনুষ্ঠানে মুনীর স্যার 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। কণ্ঠের ওঠা-নামা ও আবেগ মথিত আত্মস্থতায় এবং চিত্রময়তার অভিযোজনায় স্যারের আবৃত্তিতে যেনো একটা ঐন্দ্রজালিক আবহ তৈরি হতো, ফলে শ্রোতারা সম্মোহিত হয়ে যেতেন।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ড.আজাদ ও মুনীর চৌধুরী আদর্শিক বন্ধু ছিলেন- উভয়েই বামপন্থী চিন্তা চেতনায় ঋদ্ধ ছিলেন। 'প্রগতি সাহিত্য সংঘের' সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। বামপন্থী কার্যকলাপের জন্য জেল খেটেছেন। এরপর কোথায় যেনো কি হয়ে গেলো! আমরা ভুলে যাবোনা যে, পোষা বাঘ যেমন খাঁটি বাঘ নয়- তেমনি পোষা শিল্পীও স্বাধীন সত্তাবান শিল্পী নন। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক ও শিল্পী আছে তারা প্রলোভনের টোপ প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করে আবার গোপনে ছিপ সমেত গিলে ফেলতেও অনীহা নেই।

আমার প্রতি ড. আজাদের নিখাদ ও আন্তরিক ভালোবাসা ছিলো। ইন্টামিডিয়েটে আমি বাংলা ও লজিকে লেটার মার্কস নিয়ে পাশ করি। ইংরেজিতেও আমি ৭৫% মার্কস পাই। আমার ইচ্ছে ছিলো আমি ইংরেজিতে অনার্স পড়বো। পরামর্শের জন্য আমি আগামসি লেনে ড. আজাদের বাসায় যাই। তিনি আমাকে মুনীর চৌধুরী স্যারের বাসায় নিয়ে গেলেন। অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক হলো- বাংলায় অনার্স পড়বো। গর্বের বিষয় তিনি আমাকে আবদুল হাই স্যার, মুনীর স্যার, আহমদ শরীফ স্যার, কাজী দীন মুহাম্মদ ও নীলিমা আপার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এরই ফলে আমার অনার্সের মৌখিক পরীক্ষার সময় বোর্ডে হাই স্যার এই বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যে,'ও আলাউদ্দিন আল আজাদ ও শামসুর রাহমানের এলাকার মানুষ'।

ড. আজাদ আমার প্রকাশিত বই ও পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা খুবই আগ্রহের সাথে পড়তেন এবং আমাকে চিঠি লিখতেন লেখা প্রসঙ্গে।

বছর দেড়েক আগে আমার ছোট মেয়ে সেঁজুতি একটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে ড. আজাদের বাসায় গিয়েছিলেন সাক্ষাৎকারের জন্য। তিনি অশ্রুভেজা কণ্ঠে আমার মেয়েকে বললেন, 'সফিউদ্দিন আমার ছোট ভাই- ও কেনো আমার বাসায় আসে না?' তাঁর একটি সারল্য ও অনুভূতিপ্রবণ মন ছিলো। শেষের দিকে সভাসমিতি ও উৎসব অনুষ্ঠান থেকে বলতে গেলে নেপথ্যেই চলে গেলেন। মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন

জাগতো তিনি কী ইচ্ছে করেই অন্তরীণ জীবন যাপন করছেন, না কেউ তাকে উত্তরার পাষাণ প্রাচীরে অন্তরীণ করে রেখেছে।
একমাত্র পুত্র মারা গেলো। উৎসব অনুষ্ঠান আর সাহিত্য ও লোকালয় থেকে দূরে চলে গেলেন, 'সোনার তরী'র সেই কৃষকটির মতোই কি তিনি দীন কণ্ঠে উচ্চারণ করতেন-

এখন আমারে তুমি লহ করুণা করি।

আমার ক্লাসমেট মুনসুর মুসাকে বললাম, ড. আজাদ তোমার শিক্ষক, তুমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক- তাকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করো। মধুসূদনের ওপর অনুষ্ঠান হলো তিনি সভাপতি, আমি মুখ্য আলোচক। সেদিন কথা বলতে গিয়ে বারবার যেনো কোথায় হারিয়ে যেতেন।

আমার ধারণা ড. আজাদ স্ব-শাসিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না। তবে দল করে কারো বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও জানতেন না। স্তাবক দ্বারা পরিবৃত থাকার মানসিকতাও তাঁর ছিলোনা। আত্মপ্রচারে মত্ত দখলের ক্ষমতাও তাঁর ছিলোনা। বামপন্থীদের কাছে হলেন বাতিল, প্রতিক্রিয়াশীলরা কটাক্ষ করতো কমিউনিস্ট বলে, সমন্বয়পন্থীদের সম্পৃক্ততায়ও আসর পাতলেন না, সরকারি অনুকম্পায় হাঁকিয়ে চলার দৃপ্ত শক্তিও তাঁর ছিলোনা। পারিবারিক প্রতাপে থাকতেন ম্রিয়মান হয়ে- শেষ পর্যন্ত তিনি যেনো আত্মনির্বাসন নিলেন ঘরোয়া অনুশাসনে। শেষে কেউ তাকে টানলোনা- শূন্য নদীর তীরে যেনো একাই পড়ে রইলেন। অথচ সভাসমিতিতে থাকলে তাঁর এমন মানসিক বৈকল্য ঘটতোনা।

মাঝে মাঝে আমার মনে প্রশ্ন জাগতো ড. আজাদ কি কোন মোহের বৃত্তে বন্দি! আমি ধন্য ও কৃতজ্ঞ যে, আমার প্রতি তাঁর একটি নিখাদ ও গভীর আন্তরিকতা ছিলো- স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তধারা প্রকাশিত (১৯৭৫) আমার 'বৃত্তাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রনাথের উপর প্রথম বই। রবীন্দ্রনাথকে 'বৃত্তাবদ্ধ' বলায় তখনকার সাপ্তাহিক বিচিত্রা ও দৈনিক গুলোতে চিঠি পত্রের কলামে আমাকে এক বছর গালাগালি করেছে- একমাত্র ড. আহমদ শরীফ আমাকে সাহস জুগিয়েছেন। বিষয়টি ড. আজাদও ভালো করেই জানতেন। একদিন আমি তাকে বললাম, 'বৃত্তাবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের জন্য গালির গালিচায় আমি সর্বশ্রেষ্ঠ শাহান শাহ' এ প্রসঙ্গে আপনি কিছু লিখুন না। তিনি বললেন, না- সাহিত্যেতো এমন হয়েই থাকে। লিখে বরং আগুনে ঘি ঢেলে দেয়া হবে। এ সব বিষয়ে চুপ থাকাই ভালো।

শেষের দিকে ড. আজাদের কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানালে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলতেন। আমার মনে বার বারই প্রশ্ন জেগেছে কী ধরণের নিরাপত্তা! তাঁরতো কোন শত্রু নেই আর কে তাকে কেনো আক্রমণ করবে?

সরকার আবুল কালাম রচিত 'নরসিংদীর শহীদ বুদ্ধিজীবী' ও 'নরসিংদীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা' বইয়ের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে। আমাদের সিদ্ধান্ত হলো প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন ড. আজাদ। তার অনুমতি নিতে উত্তরার 'রত্নদীপে' গেলেন সরকার আবুল কালাম ও ড. আবদুল হাই সিদ্দিক। কিন্তু সেখানেও নিরাপত্তার প্রশ্ন ওঠেছে এবং পারিবারিক অসম্মতি। ক্ষোভে ও বেদনায় আমি তাকে এ বিষয়ে চিঠি লিখে পাঠালাম। তিনি আমার চিঠির উত্তর পাঠালেন ঠিকই তবে অনুষ্ঠানে যোগদান প্রসঙ্গে নিরুত্তাপ থাকলেন। মূল বিষয় এড়িয়ে তিনি বরং আমার সাহিত্যকর্ম এবং তার ওপর লেখাকেই অধিক গুরুত্ব দিলেন।

আমি এখানে তাঁর চিঠিটি উপস্থাপন করছি। এবং মৃত্যুর আগে ড. আজাদের এই চিঠিই আমার কাছে শেষ চিঠি-

**প্রফেসর ড. সফিউদ্দিন আহমদ** **১৫.০১.০৮**

**প্রিয় বরেষু,**

**আমি এখন এক মানসিক বিপর্যয়ে নিমজ্জিত ও ক্লান্ত। শেষ পর্যন্ত আপনিও আমার ওপর বিমুখ হলেন? আমার ওপর লেখায় আপনি কতোটুকু অগ্রসর হয়েছেন তা জানাবেন। আপনি তো একজন বড়ো মাপের লেখক, মৌলিক গবেষক এবং দক্ষ অনুবাদকও। ইতোপূর্বে আপনাকে আমার জীবনের অনেক তথ্য পাঠিয়েছি-**

**আপনি এগুলোকে কাজে লাগান এবং লিখতে থাকুন। আপনার 'ডিরোজিওঃজীবন ও সাহিত্য, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, ভাষার সংগ্রাম-শিক্ষার সংগ্রাম, এবং সক্রেটিস, ডিরোজিও, পাবলো নেরুদা ও র‍্যাঁবোর অনুবাদ আমাদের সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। আপনাকে নিয়ে কবীর চৌধুরী সাহেবের লেখাটি পড়ে খুশী হয়েছি- তাঁর এ মূল্যায়ন যথার্থই সার্থক মূল্যায়ন। প্রকৃতপক্ষেই আপনি একজন মৌলিক ও সত্যনিষ্ঠ গবেষক। আমার ওপর আপনার লেখা তাড়াতাড়ি শেষ করুন। পরবর্তীতে আমি আরো তথ্য পাঠাবো। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করুন। বিদায় চাচ্ছি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। বিনীত**

**আলাউদ্দিন আল আজাদ**
**১৫.০১.০৮**

বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময় ও মৌলিক প্রতিভাবান শিল্পী আলাউদ্দিন আল আজাদ। বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধায় সাহসী শিল্পী আজাদ কারো সাথে কোনো প্রতিযোগিতা করে হেরে যান নি এবং কারো সাথে কোন প্রতিযোগিতাও তিনি করেন নি আর কেহ তাকে কোন দিন হারিয়েও দেননি। যেনো কোন এক অদৃশ্য শক্তির অনুশাসনের ইঙ্গিতে নিজের অতলান্তেই তিনি অন্তরীণ হয়ে গেছেন।

**অনুবাদগুলি ভালো হওয়া চাই, একই সঙ্গে বিশ্বস্ত ও সুখপাঠ্য। অনুবাদের জন্যই আমাদের সাহিত্যের চাইতে গুণগত বিচারে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের অনেক দেশের অনেক সাহিত্যকর্ম বিশ্বের পাঠকদের কাছে পৌঁছে গেছে এবং স্বীকৃতিও লাভ করেছে।**

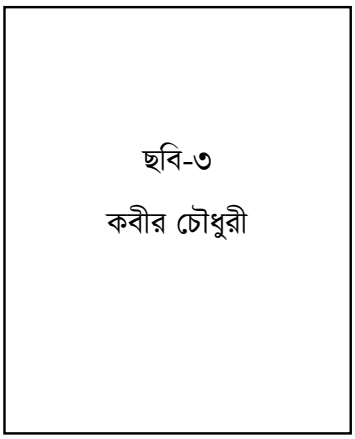


# বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত কিংবদন্তী জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার*

*অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যের এক জীবন্ত কিংবদন্তী। বাংলা সাহিত্যকে যিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে দাঁড় করিয়েছেন অত্যন্ত সমৃদ্ধ অবয়বের মধ্য দিয়ে। যার পরিচয় একাধারে জাতীয় অধ্যাপক, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, অর্থাৎ সাহিত্যের কঠিনতম অধ্যায়টিকে জুড়ে। বাংলা থেকে অন্যান্য ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলায় তাঁর অনূদিত কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। আমাদের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি সাহিত্য পত্রিকার উপদেষ্টা পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্যও তিনি।*

*কবির চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। ১৯৩৮ সালে ঢাকা কলেজিয়েট কলেজ তেকে এইচ এস সি ১৯৪৪ সালে ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে এইচ এস সি ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৪৫ সালে একই বষয়ে একই প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে পুনরায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন ১৯৫৫ সালে। সাহিত্য সম্পর্কে ১৯৫৭-১৯৫৮ সালে ফুল ব্রাইট বৃত্তি নিয়ে আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে তিনি কর্ম জীবন অতিবাহিত করেন।*

*দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পদকসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে মুখোমুখি হয়েছিলাম কবীর চৌধুরী*

* সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন ড. রিটা আশরাফ, সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকা।

*স্যারের। সাহিত্যের নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম তাঁর কাছে। স্যারের কাছে যে বিষয়গুলো জানতে চেয়েছিলাম–*

**সাঃ পঃ** বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

**কঃ চৌঃ** বাংলাদেশের সেরা সাহিত্যিকদের রচনা বিশেষ উন্নত মান সম্পন্ন। কথা সাহিত্যে শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন, শওকত আলী, আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখের গল্প উপন্যাস নিঃসন্দেহে বিশেষ উলেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। কবিতায় শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, মোহাম্মদ রফিক, আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, তসলিমা নাসরিন সহ আরো কয়েজন আছেন যারা উচ্চ মানের কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন। নাটকে মুনীর চৌধুরী, নূরুল মোমেন, আবদুলল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ এবং আরো কয়েকজনের নাম করতে হয়। প্রবন্ধ সাহিত্যে আহমদ শরীফ, শামসুজ্জামান খান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ উলেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এদের বাইরেও সাহিত্যের সকল শাখাতেই আরো উলেখযোগ্য লেখক আছেন যাদের নাম হয়তো বাদ পড়ে গেছে। আসল কথা হলো বাংলাদেশের সাহিত্যে বেশ কিছু উন্নতমানের রচনা আছে যা প্রশংসার যোগ্য। তবে সেসব বাদ দিলে আমাদের সাহিত্যের গড়পড়তা মান নিতান্তই মাঝারি ধরনের।

**সাঃ পঃ** বিশ্ব সাহিত্যের সাথে বাংলাদেশের সাহিত্য কতটুকু মান সম্মত বলে আপনি মনে করেন?

**কঃ চৌঃ** আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সেরা কাজগুলি নিঃসন্দেহে বিশ্বের উন্নত সাহিত্য কর্মের সমমানের।

**সাঃ পঃ** আমাদের সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে অনুবাদক হিসেবে আপনার বিশেষ অবদান রয়েছে। আমাদের সাহিত্যে অনুবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন স্যার।

**কঃ চৌঃ** অনুবাদ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আরো অনেক অনুবাদ হওয়া দরকার। ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায়। তবে অনুবাদগুলি ভালো হওয়া চাই, একই সঙ্গে বিশ্বস্ত ও সুখপাঠ্য। অনুবাদের জন্যই আমাদের সাহিত্যের চাইতে গুণগত বিচারে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের অনেক দেশের অনেক সাহিত্যকর্ম বিশ্বের পাঠকদের কাছে পৌঁছে গেছে এবং স্বীকৃতিও লাভ করেছে।

**সাঃ পঃ** ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশুনা এবং ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষক হয়েও আপনার আধিপত্য এবং পরিচিতির ব্যাপকতা বাংলা সাহিত্যে। এটি কিভাবে হলো?

**কঃ চৌঃ** আধিপত্য কথাটি আমি গ্রহণ করছি না। প্রশ্নের বাকি অংশের উত্তরে বলবো যে স্বদেশ ও স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা এবং একটা দায়বদ্ধতার বোধ থেকে আমি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাংলায় লিখি, যদিও ইংরেজিতেও আমার বেশ কিছু বই আছে।

**সাঃ পঃ** স্যার, এবার আমাদের 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ' নিয়ে একটি প্রশ্ন। বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মাঝে একমাত্র এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকেই রয়েছে বাংলা সাহিত্যের ওপর অনার্স-মাস্টার্সসহ পূর্ণাঙ্গ কোর্স। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলুন।

**কঃ চৌঃ** এশিয়ান ইউনিভার্সিটির এই ব্যবস্থা বিশেষ অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। মাতৃভাষার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার মূল্য খুব বেশি। সাহিত্য চর্চা ছাড়াও এর মধ্য দিয়ে স্বদেশ প্রেম বিকাশের সুযোগ ঘটে।

**সাঃ পঃ** বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মাঝে একমাত্র 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ' থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে একটি সাহিত্য পত্রিকা। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলুন স্যার। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা আরও উন্নত মানের করা যায় কিভাবে সে সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ দিন।

**কঃ চৌঃ** আমি এই উদ্যোগের বিশেষ প্রশংসা করি। পত্রিকাটিতে কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ রাখা যেতে পারে, যেমন, পাঠক প্রতিক্রিয়া, সাংস্কৃতিক সংবাদ, সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বা দুটি, দেশের অথবা বিদেশের সাহিত্য কর্মের সমালোচনা, কার্টুন চিত্র, অনুবাদ গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ----------।

**সাঃ পঃ** মানুষের জীবনে সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে স্যার কিছু বলুন।

**কঃ চৌঃ** বিশাল। উন্নত সাহিত্য পাঠ পাঠকের জীবনকে উন্নত করে তোলার পথ দেখায়। তা ছাড়া নান্দনিক আনন্দ লাভের দিক তো আছেই।

**সাঃ পঃ** বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননাসহ অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরুস্কারে ভূষিত হয়েছেন আপনি। এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি এবং সাহিত্য জগতে পুরস্কারের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

**কঃ চৌঃ** পুরস্কার প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে প্রাপককে আনন্দ দেয়, প্রাপকের মনে অধিকতর দায়িত্ববোধও জাগিয়ে তোলে। তবে দাতাদের উদ্দেশ্য, সততা, নিরপেক্ষতার বিষয়াদি সর্বদা স্বচ্ছ ও বিতর্কের উর্ধে থাকা দরকার।

এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

# হিজাব

ঢাকার বাসগুলোর যাত্রীদের মধ্যে অনেক সময় বসার বা দাঁড়ানোর স্থান দখল ছাড়াও নানা বিষয়ে নরম-গরম তর্ক-বিতর্ক ও গালগল্প জমতে দেখা যায়। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, দূর্নীতি, দ্রব্যমূল্য-সবকিছুই তাদের আলোচনায় উঠে আসে। এসব আলাপচারিতা কোন কোন সময় তুমুল তর্কযুদ্ধ ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে রূপ নেয়। আবার কখনো তা রীতিমতো একাডেমিক ও আদর্শিক আলোচনার রূপ পরিগ্রহ করে। এ সকল আলোচনা বা বিতর্ক কয়েক মিনিট থেকে ঘন্টাকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। কোন কোন সময় শেষ ষ্টপেজে পৌঁছেও তা শেষ হতে চায় না। বাধ্য হয়েই তখন উভয় পক্ষকে তর্কে ক্ষান্ত দিয়ে বাস থেকে নেমে যেতে হয়।

উত্তরা থেকে মতিঝিলগামী একটি দোতলা ভলভো বাসে ডিসেম্বর দু'হাজার আটের কোনও একদিন সকালে অপরিচিত একজোড়া যুবক-যুবতীর মধ্যে অনুরূপ একটি তর্কযুদ্ধ লেগে যায়। সাধারণ কথা কাটাকাটি থেকে বিষয়টির সূত্রপাত হলেও কথা বেড়ে গিয়ে-বিশেষত যুবকটির আক্রমণাত্মক কথায় এক পর্যায়ে তা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ বাহাসের রূপ লাভ করে। আজমপুর থেকে শাহবাগ পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলা বাকযুদ্ধটি আমি খুবই উপভোগ করি। অফিস টাইম হবার কারণে স্থানে স্থানে বাসটি প্রচন্ড যানজটে পড়লেও অন্যদিনের মতো সেদিন আমি একটুও বিরক্তবোধ করিনি। বিতর্কের শেষ পর্যায়ে আমি বুঝতে পারি যে, ছেলেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি গবেষক এবং মেয়েটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। দু'জনই মেধাবী। তবে মেয়েটিকে আমার অধিক মেধাবী ও চৌকস বলে মনে হয়েছে। শাহবাগে তারা নেমে যাবার পর স্ব-ঘোষিত বিচারক সেজে মনে মনে আমি বিতর্কের জয়-পরাজয় সম্পর্কে একটি রায় প্রদান করি। বলাবাহুল্য, আমার রায় মেয়েটির পক্ষে যায়।

ভলভো বাসের অনির্ধারিত এ বিতর্কটি আমার মতো অন্যদের কাছেও সমান উপভোগ্য হবে মনে করে আমি এটি অনেক কষ্টে ছাপার অক্ষরে বন্দি করে আপনাদের সামনে হাজির করলাম। তার্কিক যুবক-যুবতীর নাম না জানলেও তারা আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকার ফলে বাকযুদ্ধটি আমার কাছে যতটা প্রাণবন্ত মনে হয়েছে আপনাদের কাছে ততটা নাও হতে পারে। তাই বিতর্কটি পাঠকের নিকট মোটামুটি জীবন্ত ও স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে একটি করে কাল্পনিক নাম দিয়েছি। ঘটনাটি ভলভো বাসে ঘটায় এর শিরোনাম প্রথমে আমি ভেবেছিলাম 'ভলবো-কাহিনী'। কিন্তু বিতর্কটির সিংহভাগ জুরে পর্দার

কথা আলোচিত হওয়ার কারণে এর নাম দিলাম 'হিজাব'-যা বর্তমান মিডিয়ার একটি উত্তপ্ত আলোচ্য বিষয়।

নাবিলা ঃ আপনি কি দয়া করে একটু সামনের আসনটিতে গিয়ে বসবেন?

শাহেদ ঃ কেন? কি জন্য আমি সামনের আসনে গিয়ে বসবো?

নাবিলা ঃ ওখানে একজন পুরুষ বসেছেন তো। অন্য একজনের জায়গা খালি পড়ে আছে। আপনি ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে বসতে পারেন।

শাহেদ ঃ আমি ইচ্ছা করলে তা পারি। কিন্তু খামোকা আমি অমন ইচ্ছে করতে যাব কেন? এতে আপনার কী লাভ?

নাবিলা ঃ লাভ আমার একার নয়, আপনারও। আপনারা দু'জন দু'জনের ওই আসনে আরাম করে বসলেন। আর আমি ও আমার বান্ধবী আপনার ছেড়ে দেওয়া আসনটিতে স্বাচ্ছন্দে বসলাম।

শাহেদ ঃ প্রস্তাবটি মন্দ নয়। আপনার কথার মর্ম আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, আসলেই এর কোনো প্রয়োজন আছে কি?

নাবিলা ঃ হয়তো আপনার কাছে নেই। কিন্তু আমাদের কাছে এটি অপ্রয়োজনীয় নয়।

শাহেদ ঃ দেখুন, একটি সাধারণ বিষয়কে অযথাই আপনি জটিল করছেন। আমি আপনাকে একটি সহজ সমাধান দিচ্ছি। আপনাদের যে কোন একজন আমার পাশের শূন্য স্থানে এবং অপরজন সামনের সিটের লোকটির পাশে গিয়ে বসে পড়ুন। দেখবেন, আর কোন সমস্যাই থাকছে না। দেরি করলে হয়তো আপনারা সে সুযোগটিও হারাবেন।

নাবিলা ঃ তবুও আপনি এ সামান্য স্যাক্রিফাইসটুকু করবেন না, যা একটি সাধারণ সৌজন্যবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

শাহেদ ঃ আমি বিষয়টি এভাবে দেখছি না। আমার মতে এখানে স্যাক্রিফাইস বা সৌজন্য বোধের প্রশ্নটি বড় নয়। এখানে বরং আমার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বোধের প্রশ্নটিই বড়। আমি যেখানে আছি সেখানে থাকাটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার।

নাবিলা ঃ আপনার এ এক অদ্ভুত যুক্তি। একটি আসন ছেড়ে বসার সুযোগ করে দেওয়ার সঙ্গে স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন জড়িত-এ এক উদ্ভট চিন্তা। এটিতো বরং সাধারণ ও শিষ্টাচারের মধ্যে গণ্য, যা মানুষের একটি প্রশংসনীয় গুণ।

শাহেদ ঃ আপনার এ মূল্যায়ন সম্পূর্ণ একদেশদর্শী ও পশ্চাৎমুখি। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাসে বা ট্রেনে একজন মহিলার অসংকোচে একজন পুরুষ

সহযাত্রীর পাশে বসতে না পারার মানসিকতা মোটেই আধুনিক নয়-বরং তা মধ্যযুগীয় মানসিকতার পরিচায়ক। এরূপ মানসিকতা মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও উন্নয়নের পরিপন্থী। তাই পরিহার্য।

নাবিলা ঃ আশ্চর্য! কী অদ্ভুত সরলীকরণ। অযৌক্তিকতা ও অবিমৃশ্যচারিতার কী আজব সংমিশ্রণ! ট্রেনে-বাসে অনাত্মীয় যুবক-যুবতীর আনন্দভ্রমন। পথেঘাটে, কর্মস্থলে ও শপিং মলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সাথে অগ্রগতি ও উন্নয়নের কী সম্পর্ক? সভ্যতার অগ্রগতি তো মানুষের মেধা, শ্রম, প্রজ্ঞা ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের ফল। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার, মুসলমানদের স্পেন বিজয় এবং বৃটিশদের ভারত-শাসন কি তবে কৃষাণ ও কঙ্কনের মধুচন্দ্রিমার পরিণতি ছিল? পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের পাশ্চাত্য রেনেসা, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লব ও বিশ শতকের চীন ও রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কি ছিল নারী পুরুষের একসাথে পাশা খেলার ফলশ্রুতি? সভ্যতা, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কি এতই ঠুনকো জিনিস যে, তরুণ-তরুণীদের পাশাপাশি পথচলা, মিশ্র আড্ডা ও বন্ধনহীন উচ্ছলতা দেখে তা হাতের মুঠোয় এসে আপনা-আপনি ধরা দিবে?

শাহেদ ঃ আমি এ কথা বলছি না। আপনার বক্তব্যের সারকথা আমি বুঝতে পেরেছি। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠে পিএইচ ডি'র ছাত্র হিসেবে আমিও জানি যে, মানব সভ্যতার এ পর্যায়ে পৌঁছাতে মানব প্রজাতিকে অনেক পরিশ্রম, অনেক লড়াই করতে হয়েছে। এ দীর্ঘ যুদ্ধে নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান তালে লড়তে না পারলেও কাছে থেকে সাধ্যমতো সহযোগিতা দিয়েছে, পেছন থেকে প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু আপনার মতো যে সকল নারী দু-তিন খন্ড কালো কাপড়ে আপাদ-মস্তক নিজেদের আবৃত রাখে, ইসলাম ও পর্দার নামে সর্বদা নিজেদের গৃহাভ্যন্তরে বন্দি রাখে, বাইরে বের হলে বোরকা নামক কিম্ভুৎকিমাকার আচ্ছাদনের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখে, প্রকৃতির শোভাদর্শন ও আল্লাহর দেওয়া আলো বাতাস থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখে, নারী হয়েও তারা আজ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নারীপ্রগতি, নারীর স্বাধিকার অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রধান অন্তরায়। তাদের পরিবর্তন প্রয়োজন।

নাবিলা ঃ নারী-প্রগতি, নারী-অধিকার, নারীর-ক্ষমতায়ন! বাহ, কী সুন্দর শ্লোগান। শব্দের কী বাহারি ফুলঝুরি! আজকাল এক শ্রেণীর নারী ও পুরুষের কণ্ঠে শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি কানে সুধা বর্ষণ করে। সভা-সমিতিতে, নাট্যমঞ্চে, প্রচার মাধ্যমে, জাতীয় নেতৃবৃন্দের মুখে বার বার কথাগুলো শুনে ভাবতে ভালই লাগে যে, এবার বুঝি সত্যি সত্যিই নারীর সুদিন ফিরে আসলো। কিন্তু বর্তমান সমাজের বাস্তবতার দিকে ফিরে তাকালে কি তাই মনে হয়? আমাদের আকাশ ও স্থলপথ দিয়ে প্রতিদিন কতো শত সহস্র নারী ও নারীশিশু যে বিদেশে পাচার হয়ে মানবেতর ও অন্ধকার জীবন যাপনে বাধ্য হয় তার কিছু খোঁজখবর রাখেন কি? উন্নত ও আলোকিত বিশ্ব ইউরোপ-আমেরিকার বাসগৃহে, রাস্তায়, অফিসে, বাজারে, গাড়িতে ও গীর্জায় নারী ও শিশু

নির্যাতনের যে ভয়াবহ সংবাদ সেসব দেশের স্বাধীন মিডিয়া হয়ে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হয় সেগুলোর ওপর কি কখনো আপনাদের চোখ পড়ে না? পাশ্চাত্যের সভ্য জগতে আজ আপন হাতে গড়া পরিবার থেকে ছিটকে পড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সমাজ বিচ্ছিন্ন তথাকথিত হোমস-এ যাপিত প্রিয়জনের সান্নিধ্য বঞ্চিত অসহায় জীবনের কথা, আদরের নাতী-নাতনীর পরিবর্তে পুলিশের হাত ধরে রাস্তা পার হবার করুণ দৃশ্যের কথা একটু ভেবে দেখেছেন কি? অত দূরে নয়, আপনার অতি কাছের পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দেশ ভারতে জন্মের আগেই প্রতিবছর কত লক্ষ নারী শিশুর ভ্রুণ হত্যা করা হয় এবং জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন হিন্দু নারীর বিশেষত বিধবার কী অবহেলিত ও তুচ্ছ জীবন যাপন করতে হয়, সে সবের খবরাখবরতো আমাদের সকলেরই জানা রয়েছে। সমাজের পরিবর্তন কি মুখের কথা!

দ্বিতীয়ত,অন্তঃসারশূন্য চটকদার এসব শ্লোগান আল-কুরআন ও ইসলামানুসারী প্রকৃত কোনো মুসলিম সমাজে আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়। ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম, ও হজ্জ-এ পঞ্চ স্তম্ভের ওপর আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে নতুন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের পর রাসূলের মদিনার জীবনের প্রথম দিকে সাধিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহের শীর্ষে ছিল প্রেম-ভালবাসা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থানকে সুসংহতকরণ। নারীর বিরুদ্ধে প্রচলিত সকল বৈষম্য ও অবিচারমূলক মনোভাব ও আচরণকে চিরতরে রহিত করে পরিবারের ভিতরে নারীকে অর্থনৈতিক অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করা। সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, ক্ষমতা, ও মর্যাদাকে নিশ্চিত করা। ইসলামের ইতিহাসে হযরত খাদিজা, হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশার নাম পুরুষ সাহাবীদের সমান মর্যাদায় উচ্চারিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে উমাইয়া, আব্বাসীয় ও মুঘল আমলেও মুসলিম নারীদের এ গৌরবময় ভূমিকা অব্যাহত ছিল। রাবেয়া বসরী, সম্রাজ্ঞী জুবাইদা, বীরজায়া হামিদা বানু, সুলতানা রাজিয়া, সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ও বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানার মর্যাদা ও ক্ষমতার কথা কি কারো অজানা? নারী-অধিকার ও নারীর ক্ষমতার মানে নারীর শিক্ষার অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার রাজনৈতিক অধিকার। ইসলাম শুরুতেই নারীকে এ সকল অধিকার প্রদান করেছে এবং তা আজো অক্ষুণ্ন রয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন কারণে-যেমন বিদেশী শাসন, ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র, পুরুষের স্বার্থপরতা ও নারীর ঔদাসীন্য-যদি নারীর এসব অধিকার ছিনতাই হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা আজ পুনরুদ্ধার করে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শ্লোগানগুলো হিন্দু সমাজে প্রাসঙ্গিক হতে পারে যেখানে নারীরা বরাবর অপাঙক্তেয় ও অবহেলার বস্তু। স্বামীর মৃত্যুর পর তরুণী ভার্যার যে সমাজে বেঁচে থাকার কোনো উপলক্ষ্য থাকে না। স্বামীর চিতায় ভস্মীভূত হওয়াই যার নিয়তি। পাশ্চাত্য সমাজে হতে পারে সেখানে নারীরা ভোগ্যপণ্য ও বিনোদন সঙ্গিনী। অলিম্পিকসহ প্রতিটি

আন্তর্জাতিক খেলার আসর কি আজ নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শনীর সবচেয়ে জমকালো আয়োজন নয়? সভ্যবিশ্বের সর্বাধিক আলোকপ্রাপ্ত, আলোচিত ও দর্শনীয় বিনোদন জগৎ কি আজ মানব সভ্যতার অধপাতের সর্বনিম্ন বিন্দুতে পতিত হয়নি? কোনো কোনো প্রাচ্য সমাজে নারীর দুর্বল, পশ্চাদপদ ও অবহেলিত অবস্থা সত্যিই সমালোচনার বিষয় ও প্রতিকারযোগ্য সমস্যা। কিন্তু তা করতে হবে গঠনমূলক ও কল্যাণকর ভাবে। অসৎ উদ্দেশ্য ও সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার পক্ষে নয়। সমাজকে এক চরম থেকে অন্য চরমে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। মা-ভগ্নি-স্ত্রী-কন্যাকে বন্ধনমুক্ত করে ঘরের লক্ষ্মী থেকে বারাঙ্গনা, বিজ্ঞাপনের পণ্য, ভ্রমণ সঙ্গিনী, মঞ্চের নর্তকী ও অর্দ্ধনগ্ন অ্যাথলেট করার জন্য নয়!

এবার শুনুন আপনাদের সবচেয়ে মুখরোচক বিষয় পর্দা প্রসঙ্গে। মনের ক্ষোভে আপনারা এর নাম দিয়েছেন অবরোধ প্রথা। যারা পর্দা মেনে চলে তাদের বলে থাকেন অবরোধবাসিনী, বোরকাধারিনী ইত্যাদি। বিশেষণগুলো ব্যঙ্গার্থক হলেও এগুলো বাংলা ভাষার সম্পদ এবং বেশ মজাদার।

আপনাদের মতো প্রগতিবাদী ও আধুনিকতার দাবিদারদের নিকট পর্দা নারীর একটি অশোভন বহিরাবরণ এবং নারীর ব্যক্তিত্ব ও প্রগতি বিরোধী জঞ্জাল ও বর্জ্য হিসেবে বিবেচিত। এটি ফারসি শব্দ যা উর্দুর মাধ্যমে বাংলায় প্রবেশ করেছে। এর আরবি পরিভাষা 'হিজাব'। যার আভিধানিক অর্থ আবরণ, আচ্ছাদন, পর্দা বা স্ক্রীণ যা কারো দৃষ্টি থেকে কোন কিছু আড়াল করার জন্য বিভেদক বা প্রতিবন্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হিজাব ইসলামী শরীয়ার একটি মৌলিক বিধান এবং ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। আল-কুরআনের বহু স্থানে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত কোনো প্রাকৃতিক বিধানই যেমন মহাবিশ্বের জন্য ক্ষতিকর নয় তেমনি হিজাবসহ ইসলামের কোনো নির্দেশই মানুষের জন্য অহিতকর নয়।

হিজাবসহ ইসলামের সকল বিধান মেনেই মরুভূমির আরব মুসলমানরা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মহাশক্তিধর তিনটি সভ্যতাকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রায় হাজার বছর এককভাবে বিশ্বকে শাসন করেছে। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমর নীতিতে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে। পরবর্তীতে আল-কুরআন ও নবীর আদর্শ পরিত্যাগ করে ভোগবিলাসে লিপ্ত হবার কারণেই মুসলমানদের সাম্রাজ্য ও নেতৃত্ব হারাতে হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয়রা মুসলমানদের যে কয়টি প্রতিষ্ঠানে শক্ত আঘাত হেনেছে তন্মধ্যে হিজাব একটি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে মুসলিম জনগণ একে এনে নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার পর যখন ইসলামের ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে, তখন আরম্ভ হয় ষড়যন্ত্রের নতুন অধ্যায়। তা হলো রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং নানা কৌশলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে মুসলিম দেশসমূহে একটি অনুগত গোষ্ঠী তৈরি করে তাদের দিয়েই ইসলামী

বিশ্বে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ সকল অপতৎপরতার মধ্যে সম্প্রতি কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও একটি ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিম দেশে আইনের মাধ্যমে হিজাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এতেই বোঝা যায়, খ্রিষ্টান বিশ্ব ইসলামী হিজাবকে কতো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। মুসলিম নারীর মাথার একখন্ড বস্ত্র হরণের জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের কতো ব্যাপক প্রস্তুতি। এ যেন আরেক ক্রুসেড। আমার বিশ্বাস, আগেরগুলোর মতো এ ক্রুসেডেও পাশ্চাত্যই হারবে। একুশ শতকের জাগ্রত মুসলিম তরুণীরা যেন প্রতিক্ষা করে বসেছে, 'শির দিব, ছাড়িব না সূচাগ্র শিরাবরণ'। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের যতটুকু মর্যাদা তা ইসলামকে ধরে রাখার কারণে এবং যতটুকু জিল্লতি তা ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারণে।

শাহেদ ঃ দেখুন, ইতোমধ্যে সামনের সিটটি ওকোউপাইড হয়ে গেছে। আমি আবার আপনাদের অনুরোধ করছি। আমি দাঁড়িয়ে যাই, প্লীজ আপনারা এখানে বসে পড়ুন। তাতে বরং আমিও স্বস্তি পাব।

নাবিলা ঃ উত্তরা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। এখন আর বসার প্রয়োজন নেই। আমরা শাহবাগ নেমে যাব। আমি বরং আমার কথাটা শেষ করে ফেলি। আপনি আমার দুর্বল স্থানে আঘাত করেছেন। আমরা যারা হিজাব ব্যবহার করি বুঝে শুনেই করি। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালনের জন্য করি। হিজাব একটি বিধান, একটি আদর্শ, একটি প্রতিষ্ঠান। এটি মুসলিম নারীর ভূষণ, ইজ্জতের গ্যারান্টি, আভিজাত্যের প্রতীক, উম্মাহর শ্রেষ্ঠ রমণীদের মহান উত্তরাধিকার। বেগম রোকয়াসহ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ রমণীগণ, যাঁরা এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মাতা, পত্নী ও ভগ্নি, তাঁদের সকলেই ছিলেন হিজাবের একনিষ্ঠ অনুসারী। প্রকৃত হিজাব একজন নারীর শুধু পবিত্রতা, সতীত্ব, ধার্মিকতা ও সম্ভ্রম বোধেরই পরিচায়ক নয়, বরং এটি তার আদব-কায়দা, আভিজাত্য, সুরুচি এবং পারিবারিক ঐতিহ্যেরও পরিচায়ক। সুতরাং হিজাব মানে কেবল বোরকা বা শরীর আবৃতকারী একটি চাদর নয়, যা আজকাল রূপজীবী বা পেশাদার অপরাধীরাও ব্যবহার করে থাকে। বরং এটি প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং আত্মা ও দেহের বিশুদ্ধতার প্রতিনিধিত্বকারী। তা যদি না হয় তবে হিজাব একটি সাধারণ পোষাক বা ফ্যাশন বৈ আর কিছু নয়।

হিজাব কেন আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা, নারী-উন্নয়ন, নারীর অধিকার অর্জন ও ক্ষমতায়নের পথে অন্তরায় হবে? শুধু ইসলামে নয়, হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং ইহুদী ধর্মেও ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে হিজাবের অস্তিত্ব রয়েছে। বনেদি হিন্দু পরিবারে প্রাচীনকাল থেকেই পর্দার রেওয়াজ প্রচলিত। এটি তাদের কৌলীন্যের প্রতীক। ঘোমটা, গুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, অন্ত:পুর, পুরনারী প্রভৃতি বাংলা এবং সংস্কৃত শব্দই এর প্রমাণ। পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও মিসরসহ মুসলিম দেশসমূহের হিজাবধারী নারীরা হিজাব বিহীনদের তুলনায় শিক্ষা, গবেষণা ও চাকরিসহ জীবনের কোনো

ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। বর্তমানে বাংলাদেশের বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ইসলামপন্থী শত শত মেয়ে পড়ালেখা করছে। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন মেধা-তালিকায় তারা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে এগিয়ে রয়েছে।

শাহেদ ঃ আপনার এ দাবির যথার্থতা আমি স্বীকার করি। ঢাবির বিভিন্ন অনুষদ এমন কি মেধাভান্ডার বলে কথিত আইবিএ-তেও এমনটি দেখা যায়। কিন্তু এতে হিজাবের ভূমিকা কি? হয়তো তারা ব্যক্তিগত মেধা, পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং অনুকূল পরিবেশের কারণেই অন্যদের থেকে ভালো করছে। কৃতিত্বটা হিজাবে প্রাপ্য হবে কেন?

নাবিলা ঃ কোনো বিশ্বাস বা বিধানই উপর থেকে হঠাৎ পতিত হয় না। তার জন্য প্রস্তুতি লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিকূল পরিবেশে একটি মেয়ে যখন বোরকা বা স্কার্ফ পরিহিত অবস্থায় ক্লাসে আসে তখন বুঝতে হবে, সে এতে আগে থেকেই অভ্যস্ত। পরিবার বা কলেজেই তাকে তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ হিজাব তাকে দিনে দিনে ধার্মিকতা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছে। পরিবার বা আদর্শিক শিক্ষা পতিষ্ঠানে একজন তরুণীকে হিজাবের সঙ্গে সঙ্গে ছোট থেকেই সালাত, সিয়াম, সত্যবাদিতা, মিথ্যাচার, কর্তব্যনিষ্ঠা এককথায় ইসলামী জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিক্ষা জীবনেও এর অনুকূল প্রভাব পড়ে এবং স্বভাবতই ফলাফল ভাল হয়।

শাহেদ ঃ হিজাবের অনুসারী হিসেবে আপনি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই পারেন। আমি এমন সহজ সাধারণ সরলীকরণে বিশ্বাসী নই। হিজাবের বাইরেও প্রচুর মেয়ে ভাল রেজাল্ট করে থাকে। পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা এবং নিষ্ঠাই ভাল পারফরম্যান্সের নিশ্চয়তা দানকারী। পদার্নশিন মেয়েরা উদ্দামতা ও আড্ডা নিয়ে থাকে না বলে লেখাপড়ায় তাদের মনোযোগ বেশি। স্বীকার করি এটি হিজাবের অবদান। কিন্তু হিজাব কি মেয়েদের ওপর একটি আরোপিত কঠোরতা নয়? পরিবারের চাপ ছাড়া কি মেয়েরা স্বেচ্ছায় এটা গ্রহণ করে থাকে? অনেকে তো পর্দাকে ধর্মীয় গোঁড়ামী বলে মনে করেন। মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা বলে এর সমালোচনা করে থাকেন।

নাবিলা ঃ হিজাব ধর্মীয় গোঁড়ামি নয় বরং মৌলিক ইসলামী বিধান। কুরআন, সুন্নাহ, উম্মাহর সর্বসম্মত মত ও ইসলামী ফিকহ্ দ্বারা এটি সমর্থিত। হিজাব ধর্মান্ধতা নয় বরং ধার্মিকতা এবং ইসলামের সঠিক অনুসরণ। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিটি প্রজন্মের কোটি কোটি মুসলিম রমণী কর্তৃক নিষ্ঠার সঙ্গে এটি অনুশীলিত। হিজাব মেয়েদের ওপর আরোপিত কঠোরতা নয় বরং মনুষ্যজাতির ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। নারী সমাজের প্রতি ইসলামের মূল্যবান উপঢৌকন। যদি কঠোরতা হিসেবেও ধরে নেয়া হয় তবে তা খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের এবং এর উদ্দেশ্য মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণ। শিশুদের

পাঠাভ্যাস করাতে, রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে এবং একজন সৈনিক ও ক্রীড়াবিদকে প্রশিক্ষণ দিতে কি কম কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয়? কিন্তু, ব্যক্তি, পরিবার ও জাতির স্বার্থ এবং দেশের নিরাপত্তা ও সুনামের কথা বিবেচনা করে তা সাদরে গ্রহণ করা হয়। মুসলমানদের নিকট হিজাবের বিষয়টি এগুলোর তুলনায় আরো অধিক বিবেচনার দারি রাখে। হিজাব নারীর ধর্মাচরণ, লজ্জাশীলতা, শালীনতা ও শৃঙ্খলার প্রতীক। হিজাব মুসলিম নারীর বৈশিষ্ট্য, আত্মপরিচয় ও অহংকার। ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা যতই বিদ্রুপ করুক হিজাবের ক্রম বর্ধমান বিস্তৃতি বর্তমানে আমাদের সমাজের একটি ধনাত্মক প্রবণতা। ক্যাম্পাসে, লাইব্রেরীতে, গবেষণাগারে ও কর্মক্ষেত্রে হিজাবপন্থী নারীদের নীরব উপস্থিতি আজ একটি লক্ষণীয় বাস্তবতা। সমাজে তারা সম্মানিত ও সমাদৃত। তাদের একজন হতে পেরে আমি গর্বিত, আমার বাবা মায়ের নিকট কতৃজ্ঞ।

শাহেদ ঃ আপনার সব বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই। তবে আপনার আত্মবিশ্বাস, আপনার যুক্তি, আপনার উপস্থাপন সত্যিই কনভিনসিং। আমার আক্রমণাত্মক কথাবার্তা সত্ত্বেও আপনার সংযত, ঋজু ও ইতিবাচক জবাব আমাকে প্রভাবিত করেছে। পর্দা সম্পর্কে আমার বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছে। পর্দা নিয়ে আমার মা ও বাবার ভিন্নমত আমাদের পরিবারকে সমান দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। আমি ও আমার মা পর্দা বিরোধী কিন্তু আমার বোন ও আমার বাবা পর্দাপন্থী। আমার পিতা গ্রামের সম্ভ্রান্ত মৌলভি বাড়ির মেধাবী সন্ত ান। মেধা তাঁকে শহরে এনেছে, সি এস পি বানিয়েছে, ধানমন্ডির ধনাঢ্য পরিবারে বিয়ে করিয়েছে, বাড়ি-গাড়ি দিয়েছে কিন্তু মৌলভি বাড়ির গোঁড়া রক্ষণশীলতা থেকে একটুও হটাতে পারেনি। বাবার বড় সাফল্য, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. বি. এ.-র ছাত্রী তাঁর একমাত্র কন্যাকে পর্দা ও ধর্মানশীলনের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারী করতে পেরেছেন। এখন তিনি নামাজ রোযা ও গ্রামে সমাজ সেবামূলক কাজের ফাঁকে ঘরে বসে তার পিএইচ ডি প্রত্যাশী পুত্রের জন্য পর্দানশিন বৌ ও আদরের কন্যার জন্য নামাযী পাত্র খোঁজার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। কিন্তু ঢাবি-র বাংলার ছাত্র ও এক সময়ের নামকরা সংস্কৃতিকর্মী আমার প্রগতিশীল মা আমার বাবার এসব আবদার একদম পছন্দ করেন না। বাবার সাথে বাকযুদ্ধে তিনি আমাকে তাঁর পক্ষে চান। আমার বোন যেহেতু বাবার পক্ষে তাই ব্যালেন্স করার জন্য আমাকে সাধারণত মা'র পক্ষাবলম্বন করতে হয়। বাবার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট তাঁর স্ত্রীর আগ্রাসী তর্কে বাবা অধিকাংশ সময় শান্তি রক্ষার খাতিরে স্বেচ্ছায় হার মেনে নেন। মা তখন বীরদর্পে ঘোষণা করেন, 'আমার ছেলের বৌ আমি পছন্দ করবো। তোমার এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না'। এরূপ পরিস্থিতিতে বাবার বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় আমি মনে মনে সংকল্প করি "বাবার ইচ্ছানুযায়ী আমি পর্দানশিন বৌ ঘরে তুলবো। প্রয়োজনে মা-খালাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো"। এতোদিন পর্দা সম্পর্কে বাবা ও মা-খালাদের পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির টানাপোড়েনে আমি এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারিনি। আজ পর্দার প্রতি

আপনার কমিটমেন্ট দেখে এবং এর জন্যে আপনার অ্যাডভোক্যাসির শৈলী দেখে এ ব্যাপারে আমার মন থেকে সকল দ্বিধা দ্বন্ধ দূর হয়ে গেছে।

শুরুতে কৌতূহল বশত নিছক তামাশা করার জন্য আমি পর্দার সমালাচনায় কিছু কড়া কথা বলে ফেলেছি। ইসলামের কিছু কিছু সামাজিক বিধান ও পর্দার সমালোচক আমাদের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীলগণ এসব কথা অহরহ বলে থাকেন। ধর্মে-কর্মে আমার বাবার বিশ্বাস ও দাদীর উত্তরাধিকারের একনিষ্ঠ অনুসারী আমার ছোট বোন সারাকে ক্ষেপানোর জন্য আমি মাঝে মধ্যে এসব বুলি আওড়ে থাকি। মওকা পেয়ে আপনাদের সামনে আজ আমার যুক্তিগুলোর পুনরাবৃত্তি করলাম ও ধার পরীক্ষা করলাম। আপনি আমার সব অস্ত্র ভোঁতা বানিয়ে ছাড়লেন। আমি আমার অভব্যতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

সামিরা ঃ এতক্ষণ আমি ধৈর্যের সাথে আপনাদের কথা শুনেছি। হিজাবের কারণে আপনি প্রথমে আমাদের তাচ্ছিল্য করেছেন। আমার বান্ধবীর অনুরোধ সত্ত্বেও আমাদের বসতে দেবার মতো সামান্যতম শিষ্টাচারটুকুও আপনি দেখাতে পারেননি। আপনার ভাষায় আপনি আমাদের সঙ্গে তামাশা করেছেন। বাসে অপরিচিত মহিলার সঙ্গে কেউ কোনোদিন পরিহাস করে না। আসলে আমাদের বোরকা আপনাকে আমাদের সঙ্গে পরিহাস করতে প্ররাচিত করেছে। পরে আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা আপনার পরিহাসের পাত্র নই। আমি বুয়েটের ও আমার বান্ধবী ডিএমসি'র ছাত্রী। আমরা নারী উন্নয়নের বিরোধী নই, বরং পক্ষের শক্তি, সক্রিয় কর্মী। হিজাব কোনভাবেই আমাদের অগ্রযাত্রার পথে বাধা নয়, বরং প্রেরণাদায়ক পতাকা। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্ম বাজারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। হিজাবের পতাকা হাতে কীভাবে সেখানে নারীরা দৃপ্ত কদমে এগিয়ে চলেছে। ইরানী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা আটজন ছাত্রী। তুরস্কের মহাশক্তিধর ধর্ম নিরপেক্ষ সামরিক জান্তা দীর্ঘ পঁচাশি বছর পর আদালতে, পার্লামেন্টে ও রাজপথে আজ কীভাবে অবলা নারীর একখন্ড রেশমি শিরাচ্ছাদনকে স্যালূট দিতে বাধ্য হলো, তা একবার ভেবে দেখুন। আজ ইসলামের সপক্ষে এ বৈশ্বিক পরিবর্তনের জোয়ারের বিপরীতে কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সুশীলের সমালোচনা বাংলাদেশে হিজাবের অগ্রগতি থামিয়ে দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ধর্মনিষ্ঠ পিতৃকুল ও ধর্মনিরপেক্ষ মাতৃপক্ষের সাংস্কৃতিক রশি টানাটানিতে পর্দার ব্যাপারে এতদিন আপনি যে মানসিক দ্বন্ধ ও বৈপরীত্যে ভোগছিলেন সেটি যদি আজ কেটে গিয়ে থাকে তবে আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনাকে এ ইতিবাচক পরিবর্তনটি ধরে রাখার সামর্থ ও দৃঢ়তা দান করুন।

শাহেদ ঃ আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আপনার মঙ্গলঘট কানায় কানায় ভরে উঠুক।

সামিরা ঃ এভাবে নয়। বলুন, "আল্লাহুম্মা আমীন, আল্লাহ আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। আমাকে সত্যের পক্ষে থাকার তৌফিক দিন"।

শাহেদ ঃ আমি তা-ই বলছি, আল্লাহুম্মা আমীন। বাস শাহবাগ এসে গেছে। আমরা এখানেই নামছি। নামবার আগে আমি আমার প্রথম দিকের রূঢ় আচরণের জন্য আপনাদের কাছে আবার দুঃখ প্রকাশ করছি। জ্যামের কারণে উত্তরা থেকে এখানে আসতে আজ দেড় ঘন্টা লেগে গেল। ট্র্যাফিক জ্যাম বরাবর আমার নিকট অত্যন্ত বিরক্তিকর। কিন্তু আজকের যানজটের কথা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমত, আপনাদের বসতে না দেয়ার অপরাধ বোধের কারণে। দ্বিতীয়ত, আপনাদের সঙ্গে আজকের এ সাক্ষাৎ আমার জীবনে একটি বড় পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করার জন্যে। এ দুটোর সঙ্গে তৃতীয় কোন কারণ যুক্ত হবে কিনা তা আমি এখনো ভেবে দেখিনি। যদি হয় তবে আপনাদের আমি একদিন খুঁজে বের করবো।

আজ বাসায় ফিরে বাবাকে আমি একটা দারুণ সারপ্রাইজ দেবো। বলবো, "ড্যাড, তুমি আমার জন্য তোমার মায়ের মতো একজন বৌ খোঁজো, যিনি ছিলেন তোমার দেখা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নারী। যাঁর কথা তুমি কোনদিন বলে শেষ করতে পার না। আমার সিদ্ধান্ত আমি নিয়ে ফেলেছি। তোমার পছন্দই আমার পছন্দ। মা'কে ম্যানেজ করার দায়িত্ব থাকল আমার এবং তোমার হবু বৌমার। মায়ের সাথে হিজাবের দীর্ঘ যুদ্ধে আমি তোমার চূড়ান্ত বিজয় দেখতে চাই, বাবা। এই আমার শেষ কথা"।

প্রবন্ধ

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

# সুফিয়া কামালের কবিতা নারীভাবনা ও জেন্ডারচেতনা

কররেখায় গণ্য যে ক'জন মুসলিম নারী-লেখকের অবদানে বাংলা সাহিত্য ঋদ্ধ হয়েছে, সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) তাঁদের অন্যতম। প্রবল প্রতাপশালী তিরিশোত্তর কবিদের কালে আবির্ভূত হয়েও তিনি উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছেন নিজস্ব এক কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের জটিল বহুবঙ্কিম বহুকৌণিক জিজ্ঞাসাসংকুল জীবনবীক্ষণের পথে তিনি বিচরণ করেন নি; তাঁর পথ ছিল একান্তই সহজ সরল নিরাভরণ এবং স্নিগ্ধ মাধুর্যময়। সামাজিক অসাম্য অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অবিচল অবস্থান। দীর্ঘ সত্তর বছরের কাব্য-জীবনে সুফিয়া কামাল কেবল কবিতাচর্চা করেন নি, বরং কবিতার রাজপথ ধরেই হয়ে উঠেছিলেন আমাদের আশা আশ্বাস আর ভরসার প্রদীপ্ত এক উৎস। বস্তুত, আমাদের জাতীয় জীবনে সুফিয়া কামাল এক প্রতিষ্ঠানের নাম–সামাজিক অগ্রগতি ও নারী-জাগরণের সংগ্রামে অপরাজেয় এক শক্তির প্রতীক। রোকেয়ার মতো, শামসুন্নাহার কি ফয়জুন্নেসার মতো তাঁরও সাধনায় মিলেছিল সৃষ্টি ও কর্মের যুগপৎ ধারা–ঘটেছিল বিশ্বাস আচরণ ও সৃষ্টির এক দুর্লভ সমন্বয়।

দীর্ঘ কাব্যজীবনে সুফিয়া কামাল নানা বিষয়ে কবিতা লিখেছেন এবং পুষ্ট করেছেন বাংলা কবিতার একটি স্বকীয় ধারা। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশ শতকের তিরিশের দশকে আবির্ভূত হলেও, কাব্য-বিশ্বাসে সুফিয়া কামাল বিচরণ করেছেন উনিশ শতকী শিশুভুবনে। কবিতার বিষয় ও প্রকরণ উভয় ক্ষেত্রেই একথা সত্য। তবু মানবিক চেতনা, সামাজিক অগ্রগতি, কল্যাণ কামনা, নারী-অধিকার ও জেন্ডারধারণা–এইসব বিষয় সুফিয়া কামালের কবিতায় এনেছে ভিন্ন স্বাদ স্বতন্ত্র মাত্রা। সুফিয়া কামালের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শামসুর রাহমান লিখেছেন–'সত্য বলতে কি, বাংলাদেশে তাঁর একটি মাতৃরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা আমাদের অনুপ্রাণিত করে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগ্রামে। তাঁর এই ভূমিকা তাঁর কবিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং একথা বলতেই হবে তিনি একজন কবির চেয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রণী নেত্রী হিসাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।' কবি শামসুর রাহমানের একথা যেমন সর্বাংশে সত্য, তেমনি মিথ্যা নয়–এই ভূমিকাই সুফিয়া কামালের কবিতায় এনেছে ভিন্ন চারিত্র্য, স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা। বর্তমান আলোচনায় আমরা সুফিয়া কামালের কবিসত্তার এই ভিন্ন চারিত্র্য ও স্বতন্ত্র মাত্রা অনুসন্ধানে তাঁর সার্বিক-কবি প্রতিভা নয়, কেবল তাঁর নারীভাবনা ও জেন্ডারচেতনা বিষয়ে আমাদের

বিবেচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। ধারণা করি, ওই একক বিষয়ের আলোচনার মধ্য দিয়েই সুফিয়া কামালের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে একটা পূর্ণ ধারণা লাভ সম্ভব হবে।

## ২.

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'একালে আমাদের কাল' (১৯৮৮) শীর্ষক স্মৃতিকথায় সুফিয়া কামাল লিখেছেন–'মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল যে, মেয়েদের কিভাবে উন্নতি হতে পারে। আর পুরুষের মুক্তবুদ্ধি বিষয়ে বলতেন, পুরুষরাও যদি এগিয়ে দেয় তাহলে মেয়েদের অশিক্ষা দূর হয়। ভাই বলে উনি সম্বোধন করে বাবা বলে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিয়েছেন, লিখেছেনও। বলতেন আমাদের আর বেঁধে রেখনা, শরীয়তের দোহাই দিয়োনা–শরীয়তে তোমরা দেখ, ধর্মের মধ্যে তোমরা দেখ যে, আমাদের কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মান্ধতার মোহে আমাদেরকে আর বন্দিনী করে রেখনা। মেয়েদেরকে আর বন্দিনী করে রেখনা। নিজের ধর্মের গূঢ়ার্থটা জান। ধর্মের দোহাই দেয়ার কথা শুনে মেয়েদের উপরে এরকম তোমরা অত্যাচার কোরোনা। কোরআন হাদিসে আমাদের যতখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেটা তোমরা আগে জান। ওই যে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ করে রাখা তাকে কি পর্দা বলে? পর্দা নিজের মনের মধ্যে। সারা দুনিয়ার মহিলারা কি করে চলাফেরা করছে? সারা দুনিয়ার মহিলারা কি করে এগিয়ে আসছে? তোমরা পথটাকে সুগম করে দাও।' বস্তুত নারী সম্পর্কে রোকেয়ার এই ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল সুফিয়া কামালের মধ্যেও, এ ভাবনা যেন সুফিয়া কামালের নিজস্ব ভাবনা। তাঁর সুদীর্ঘ কাব্যজীবনে নানা কবিতায় অনেক চরণে আমরা নারী সম্পর্কিত প্রাগ্রসর ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করি। নারীকে তিনি প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে না দেখে বিবেচনা করেছেন সামাজিক লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণে। সত্তর-আশি বছর পূর্বে একজন মুসলিম নারী কবির নারীভাবনা ও জেন্ডার সচেতনতা আমাদের কাছে তাৎপর্যবহ বলে মনে হয়েছে। একুশ শতকের এই কালখন্ডে দাঁড়িয়ে সুফিয়া কামালের কবিসিদ্ধির চাইতে তাঁর এই জেন্ডার সচেতনতা অধিক মনোযোগ দাবি করতে পারে বলে বিবেচনা করি।

সুফিয়া কামাল বিশ্বাস করেন নারী কোনো অবলা জীব নয়, পুরুষের মনোরঞ্জনই তার একমাত্র কাজ–একথাও তিনি স্বীকার করেন না। নারীর মধ্যে আছে অনন্ত শক্তি, সুযোগ পেলে সেও দেখাতে পারে বিশ্ববিজয়ী রূপ–এ ভাবনায় ছিল তাঁর গভীর প্রত্যয়। নারীর দীপ্র ভূমিকা তিনি স্মরণ করেছেন, যাঁরা পুরুষপ্রদত্ত অবলাসত্তা অতিক্রম করে মানবসত্তায় নিজেদের বিকশিত করেছেন এমন নারীদের নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। এ কারণেই তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছে নারী-আন্দোলনের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, আলজিরিয়ার মুক্তিসংগ্রামী জমিলা বুপাশা, প্যালেস্টাইনি মুক্তিযোদ্ধা লায়লা খালেদ, কিংবা প্রথম নারী-নভোচারী ভ্যালেনটিনা তেরেসকোভা। এইসব উজ্জ্বল নারীকে নিয়ে কবিতা রচনার অনুপ্রাণনায় সুফিয়া কামালের অন্তর্গত মানসআকাঙ্খা অভিব্যক্ত হয়ে যায়। ওইসব

স্মরণীয় নারীকে নিয়ে রচিত কবিতাগুলোর প্রতি চোখ রাখলেই অনুধাবন করা সম্ভব সুফিয়া কামালের নারীভাবনার স্বরূপ। রোমান্টিকতার মোহন ভুবন আর ফুল-পাখি-নদী-চাঁদের জগৎ পেরিয়ে সুফিয়া কামাল যে নারীদের নিয়ে যেতে চান আলোকিত ভুবনে, সংগ্রামের মিছিলে–এটাই অধিক তাৎপর্য দাবি করতে পারে আজকের এই জেন্ডারসচেতন পৃথিবীতে। একবার দেখা যাক তাঁর কিছু পংক্তি–

ক. নারীর বাহুতে শক্তি রয়েছে, অন্তরে জ্ঞান-তৃষা,
সংশয় ভরা সংসার মাঝে আঁধার-আলোর দিশা
শত বাধা ব্যবধান
তারি মাঝ হতে, দূর হতে যেন শোনা যায় আহ্বান
দূর হতে আসে আলো!
জাগো মাতা-বধূ! তোমার ঘরের মাটির প্রদীপ জ্বালো!
('আলোর ঝরনা')

খ. আলজিরিয়ার জননী জমিলা দুলালী দুহিতা মাগো!
কতকাল হলো তন্দ্রাবিহীন নয়নে যে তুমি জাগো!
জেগে আছো মাগো! আর ক'টি দিন জাগো!
আর নেই দেরী,
গভীর রাত্রি শেষ হয়ে এলো, এবার প্রভাতফেরী।
শোনা যায় ওই, পূর্ব অচলে প্রভাত রবির কর
দিগন্তব্যাপী আঁধার নাশিয়া আসিছে তিমিরহর।
তোমার প্রাণের দীপ্তিতে দীপ জ্বলেছে আঁধার রাতে,
আলজিরিয়ার মুক্তি আলোক জ্বেলেছ তোমার হাতে।...
তোমারে ঘিরিয়া জমিলা জননী কোটি সন্তান আজ
মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লভিয়া পরেছে শহীদ সাজ।
('কারান্তরালে জমিলা')

গ. রাত্রির আঁধার ভেদি
প্রাণশক্তি যার
বিচ্ছুরিল আলোকের ধার
যে নারী কল্যাণী–
জায়া মাতা গৃহিণী জননী
তুলনা বিহীনা।
কেহ ত তাহারে ভুলিব না।
('লায়লা স্মরণে')

–উপর্যুক্ত প্রতিটি কবিতাংশে সুফিয়া কামালের নারীভাবনার প্রাগ্রসরতা প্রকাশিত হয়েছে। গৃহের সীমানা ছাড়িয়ে নারীকে তিনি রোকেয়ার মতো, জমিলা কি লায়লার

মতো এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সুফিয়া কামাল স্বপ্ন দেখেছেন, যেমন দেখেছেন 'সুলতানার স্বপ্ন'-এর লেখক রোকেয়া, নারীর সামূহিক মুক্তি। তাই অবরুদ্ধ নারীকে মুক্তির পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সুফিয়া কামাল–'সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে আজ জ্বলেছে নতুন আলো/ তোমরাও আজ সে আলো শিখায় প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।/ আর কেন দেরী! এসেছে ত দিন, এসেছে ত আবাহন/ বিশ্বের নারী দিয়ে এল পাড়ি করে এল লঙ্ঘন/ কত সে সিন্ধু, দুর্গম গিরি, লেখা হল ইতিহাস/ তোমরা কি আজও পিছে পড়ে শুধু শুনে যাবে উপহাস!/তোমরাও এস প্রাণের প্রদীপে জ্ঞানের আলোক জ্বালি/দূর করি দিয়ে আলোকের তীরে অজানা ভীতির কালি। ('অবরুদ্ধাকে')।

নারীর জ্ঞানার্জনের পথে সামাজিক পুরুষতন্ত্র তৈরি করে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল। কর্ম ও সাধনা দিয়ে, কবিতার মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতাকে আঘাত করেছেন সুফিয়া কামাল। লিবারেল নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন, সুযোগ-সুবিধা পেলে নারী বিকশিত করতে পারে স্ব-সত্তাকে, এবং এভাবে যোগ্যতার বিচারেই নারী উঠতে পারে পুরুষের সমতায়। কিন্তু পুরুষতন্ত্র নারী-পুরুষের সমতাকে সহ্য করতে পারে না। তাই যে জ্ঞান নারীকে সামাজিকভাবে পুরুষের সমতায় নিয়ে আসে, নারীর সে জ্ঞানার্জনের পথে বাধার প্রাচীর তুলে দেয় পুরুষ। লিবারেল নারীবাদীদের মতো সুফিয়া কামাল অগ্রগতির জন্য নারীকে জ্ঞানার্জনের পথে আহ্বান জানিয়েছেন, উচ্চারণ করেছেন এই অসামান্য পংক্তিমালা–

তোমরাও এস প্রাণের প্রদীপে জ্ঞানের আলোক জ্বালি
দূর করি দিয়ে আলোকের তীরে অজানা ভীতির কালি
নির্মল নীল আকাশের মতো উদার গভীর ছায়া
তোমরা আনিয়ো দু চোখ ভরিয়া ছড়াইয়া দিয়া মায়া
অবরুদ্ধারা যেখানে মরিছে রুদ্ধ করিয়া শ্বাস
সেই ঘরে ঘরে এনে দাও নব জীবনের আশ্বাস।
('অবরুদ্ধাকে')

লিবারেল নারীবাদ কিংবা র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ এই মত ব্যক্ত করে যে, পুরুষতন্ত্র পুরুষ-অধীনতা মুক্ত নারীর ব্যক্তিসত্তাকে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। পুরুষতন্ত্র নারীর উপর সব সময়ই আরোপ করতে চায় নারীত্ব ও দেবীত্বের অতুল মহিমা। পুরুষতন্ত্র নারীকে গৃহকোণে বন্দি দেখতেই ভালোবাসে, ভালোবাসে তাকে পুতুল সাজিয়ে রাখতে। সুফিয়া কামাল নারীর মধ্যে লক্ষ করেছেন ভিন্ন শক্তি, সৃজনের স্বতন্ত্র এক রূপ। '৮ মার্চ, নারী দিবস' শীর্ষক এক কবিতায় তিনি উচ্চারণ করেন এই চরণস্রোত–'দীপ্ত আলোর শিখা জ্বালি কর/আঁধার পথের রেখা/উজ্জ্বলতর। মঙ্গলকর/ কর্মের সাথে দেখা/হোক পরিচয়, হোক উত্থান-/জাগ্রত হোক নবীন পরাণ। সুকন্যা, মাতা, ভগ্নী ও জায়া জাগে/সিন্ধুতে দোলা লাগে।/নারী শুধু নহে

নারী/বিশ্বের যত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি/মহান মহৎ তারি/....জয়গান আজ তারি।'('৮ মার্চ, নারী দিবস')।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ মনে করে যে নারী ও পুরুষের মাঝে বিরাজমান অসমতা মূলত লৈঙ্গিক অসমতার প্রতিফল। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে নারী–পুরুষের বৈষম্যের মূল কারণ জৈবিক লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য। প্রখ্যাত নারীবাদী তাত্ত্বিক সুলামিথ ফায়ারস্টোন মনে করেন, পরিবার প্রথার উদ্ভবের সময় থেকেই নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়, আর বৌদ্ধিক সৃজনশীল কারিগরের মর্যাদা পায় পুরুষ। এই জায়গা থেকে নারীর প্রকৃত মুক্তির জন্য নারীর পাশাপাশি পুরুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। সুফিয়া কামাল বিশ্বাস করেন, পুরুষের পাশাপাশি নারী এগিয়ে এলেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব প্রত্যাশিত সমাজ ব্যবস্থা। 'মা'য়ের গর্কি' কবিতায় তিনি লিখেছেন–'শৌর্যে, সাহসে, সংগ্রামে নারী রবে পুরুষের পাশে।' তবে একই সঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুফিয়া কামাল তাঁর অন্তিম বিশ্বাসে নারীকে চিরায়ত জননী হিসেবেই কল্পনা করেছেন, তাকে দেখেছেন সৃষ্টির প্রত্ন-উৎস হিসেবে। নিচের পংক্তিস্রোতে তাঁর সে-বিশ্বাসই শিল্পিতা পেয়েছে-

যত বীর, যত মহান মানব
জগতে এসেছে, তারে
জঠরে ধরেছে, পালন করেছে
স্তন্যদুগ্ধ ধারে
সে যে 'নারী', সে যে মাতা মহিয়সী
কোথায় তুলনা তার!
সর্বংসহা জননী, শ্রেষ্ঠ
সৃষ্টি সে বিধাতার।
(নারী)

ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য পুরুষতন্ত্র নিজেদের ইচ্ছামতো কিছু ধারণা সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে। নারীকে ছলনাময়ী আর সামাজিক জরায়ু ভাবতেই শেখায় প্রতাপশালী পুরুষতন্ত্র। বিস্ময়কর এই যে, উনিশ শতকী কাব্যবিশ্বাসের জগতে বিচরণ করলেও আধুনিক নারীবাদীদের এই ব্যাখ্যা সুফিয়া কামালের কবিতায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'পৃথিবীর পথ' কবিতায় তিনি লিখেছেন–'মিথ্যার মুখোসতলে সত্য কাঁদে ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে,/কামনার হ্রদে ডুবে প্রেম যায় মরে!/নারী সে ছলনাময়ী! পুরুষের মদমত্ত ক্ষুধা/ মিটাইতে ক্লান্ত হয়ে কাঁদিতেছে সুন্দর বসুধা।/পুরুষের পাপ নহে! নারীর ভুলের পথ ধরি/রাখিয়াছে অসহায়া করি!' জেন্ডার-সচেতন এই পংক্তিমালা শক্তিধর সামাজিক পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক প্রবল অভিঘাত, সন্দেহ নেই। সামাজিক পুরুষতন্ত্র নারীকে যেসব অভিধায় বিভূষিত করেছে, তা ঘুচানোই নারীবাদীদের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ। সুফিয়া কামালের কবিতায় পাই এই যুদ্ধ এই দ্বৈরথের সাহসী আহ্বান–

ঘুচাব আঁধার আনি আলোকিত মুক্ত গতিপথ,
ভেঙ্গে দেবো ভীরুতার দ্বার
আমার সন্তান হোক দুরন্ত দুর্বার!
আকাশে মেলুক ডানা: সিন্ধবক্ষে জমাবে সে পাড়ি,
দুর্বলা দুহিতা নহে, হোক সবে মহিয়সী নারী।
('হোক সবে মহিয়সী')

কেবল মহিয়সী হবার জন্য নয়, সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার জন্য নারীকে তিনি ধ্বংসাত্মক হবারও আহ্বান জানিয়েছেন, উপলব্ধি করেছেন প্রতিবাদী না হলে পুরুষতন্ত্র চালিয়েই যাবে তার দাপট। তাই তিনি তীব্রভাষায় উচ্চারণ করেন ধ্বংস ও সৃষ্টির এই যুগলস্রোত–

নবীন ধানের শীষে শীষে ভরি ক্ষীর
উর্বর করি সরস করিয়া শ্যামলিমা দুই তীর
কন্যারা আজ বন্যার বেগ আনো
ধ্বংসের পরই পুনরুত্থান জানো!
আমাদের হাতে আছে অমৃত বিষ,
পাতাল নাগিনী ফুঁসিছে অহর্নিশ
সম্বরি লব কৃষ্ণ বিষের গরল আর হলাহল
অমৃত ছড়াব পৃথ্বীর বুকে, করি দেবো সুশ্যামল।
বিলাস ত নয়! সংগ্রামে লভি জয়
অমৃত মমতা ছড়াব পৃথিবীময়।
(অমৃত ছড়াব পৃথ্বী বুকে)

–সুফিয়া কামাল বিশ্বাস করেন নিপীড়িত নারী একদিন জেগে উঠবেই, চারদিকে ছড়িয়ে দেবে তার রুদ্ররোষ। নিপীড়িত লাঞ্ছিত শোষিত এই নারীরাই সুফিয়া কামালের কবিতায় জ্বলে ওঠে এইভাবে–'অরণ্য কন্যারা জাগে, জাগিয়াছে বিষাক্ত নাগিনী/ ফুঁসিতেছে রুদ্ধ রোষে, ঝলকিছে ঈশানে অশনি,/ মাতা বসুন্ধরা ক্ষুব্ধ, নিঃশেষিত মমতার মধু/ ফসল ফলে না আর, স্নেহহীন শুষ্ক চক্ষে শুধু/ কঠোর ভ্রুকুটি জাগে'। ('অরণ্য কন্যারা জাগে')

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনাকর্মে নারী-অভিজ্ঞতাকে বিশেষ তাৎপর্যে ব্যবহার করতে অধিক উৎসাহী। পুরুষতান্ত্রিকতার চোখ দিয়ে নয়, তাঁরা জগৎ ও জীবনকে দেখতে চান নারীর চোখ দিয়ে–পিতৃতন্ত্রের প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি সরিয়ে তাঁরা সামনে আনতে চান সামাজিক-সাংস্কৃতিক লৈঙ্গিক বিবেচনা। সুফিয়া কামালের কবিতায় আমরা র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের দারণা মতো নারী অভিজ্ঞতার ঋদ্ধ প্রকাশ লক্ষ্য করি। নৈর্ব্যক্তিকতার বিপ্রতীপ অবস্থানে দাঁড়িয়েই সুফিয়া কামাল কবিতায় ব্যবহার করেছেন নারীর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা। মনে রাখতে

হবে, সুফিয়া কামাল যখন কবিতা লিখেছেন, নারীবাদী তত্ত্বের তখনও ব্যাপক প্রসার ঘটেনি। তবু সহজাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আন্তরটানে তাঁর কবিতায় নারীবাদীদের অনেক ধারণারই উপস্থিতি ঘটেছে। নারী-অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিচতুষ্টয় এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য–

ক. বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লী মায়ের কোল,
যেথা ঝাউ শাখে বনলতা বাঁধি, হরষে খেয়েছি দোল!
কুলের কাঁটার আঘাত সহিয়া কাঁচা পাকা কুল খেয়ে
অমৃতের স্বাদ লভিয়াছি যেন গাঁয়ের দুলালী মেয়ে।
... ... ... ...
চৈত্র-নিশির চাঁদিমায় বসি শুনিয়াছি রূপকথা,
স্বপনে হেরেছি সুয়ো-দুয়ো রাণী, দুখিনী মায়ের ব্যথা।
তবু বলিয়াছি মার গলা ধরে: মাগো সেই কথা বল
রাজার দুলালে পাষাণ করিতে ডাইনী করে কি ছল্!
সাতশ' সাপের পাহারা কাটায়ে পাতালবাসিনী মেয়ে
রাজার ছেলেরে বাঁচায়ে কী করে পৌঁছিল দেশে যেয়ে!
('পুরানো দিনের স্মৃতি')

খ. আমি থাকিতাম মাটি হয়ে লুটে দীঘি দরিয়ার কূলে
দেখিত না কেহ, চিনিত না কেহ, মনে করিত না ভুলে।
আজ বড় জ্বালা! জানো না তো বোন! ঘর-সংসার নিয়া–
পারি নাকো আর আপন পরের নানান ভাবনা নিয়া।
... ... ... ...
তুমি বোন, মোর ভালবাসা নিয়ো, পাঠায়ো তোমার বই,
মন ভালো নেই, লিখিতে পারি না। এখন বিদায় লই।
('চিঠির জওয়াব')

গ. এতদিন বুঝি কেটে গেল ঘন ঘোরতর দুর্দিন,
আবার বাহুতে বাজুবন্দ পায়ে মল নিবে রিনঝিন।
আবার জড়াবে সুঠাম তনুতে টিয়াঠোঁট পাড় শাড়ী,
একগাল পান মুখে দিয়া যাবে বেড়াইতে ওই বাড়ী।
যেখানে নতুন 'মাষ্টার বৌ' এসেছে ক'মাস হল,
বড় ভালো বউ গ্রাম মাঝে তার গড়িয়া উঠেছে দলও।
('অঘ্রানী সওগাত')

ঘ. আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা,
তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা।
('আজিকার শিশু')

–উপর্যুক্ত প্রতিটি কবিতাংশেই সুফিয়া কামালের নারী-অভিজ্ঞতার নিপুণ প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম কবিতাংশ জেন্ডারের দৃষ্টিকোণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে গ্রামীণ কিশোরী-নারীর মনস্তত্ত্ব চমৎকারভাবে শিল্পিতা পেয়েছে। ঝাউশাখে বনলতা বেঁধে দোল-খাওয়া, কাঁচা-পাকা কুল খাওয়া, সুয়োরানী- দুয়োরানীর গল্প শোনা আর ডাইনী বুড়ির গল্প- সবকিছুই নারীর ব্যক্তিভুবনের অভিজ্ঞতা। রূপকথায় সর্বত্র যেমন দেখা যায়, তেমনি এখানেও দেখি, অপশক্তির প্রতীক হিসেবে নারীকেই কল্পনা করা হয়েছে। তবে সুফিয়া কামালের জেন্ডারচেতনার প্রকাশ রয়েছে অন্যত্র। রূপকথায় দেখা যায়, রাক্ষস-খোক্ষসের হাতে বন্দিনী নারীকে উদ্ধার করতে ত্রাতারূপে আবির্ভূত হয় কোনো এক রাজকুমার। এ কবিতাংশে কিন্তু রাজকুমারকেই ডাইনীর কবল থেকে উদ্ধার করে নারী। রূপকথার ব্যাখ্যাকে এইভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে সুফিয়া কামাল অলক্ষ্যেই প্রকাশ করে দেন তাঁর অন্তর্গত মানস-আকাঙ্খা। দ্বিতীয় কবিতাংশে সংসারে নারীর অসহায়তা ও নানামাত্রিক সংকটের কথা প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে গ্রামীণ নারীর মানসতা চমৎকার শব্দভাষ্যে রূপলাভ করছে। নতুন বউকে দেখতে যাবার আকাঙ্খা নারীর সহজাত মানস-প্রবণতা। সর্বশেষ উদ্ধৃতাংশের 'পুতুল খেলা' অনুষঙ্গ যে একান্তই নারী-অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিজড়িত, তা লেখাই বাহুল্য।

কেবল কবিতার ভাব পরিমণ্ডলেই নয়, শিল্প-প্রকরণেও সুফিয়া কামালের জেন্ডারচেতনার স্বাক্ষর বর্তমান। তিনি কবিতায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা একান্তভাবেই নারী-মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। কবিতায় তিনি পৌনঃপুনিক ব্যবহার করেন নারী, কন্যা কিংবা বন্দিনী শব্দ, ব্যবহার করেন নারী-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এইসব অনুষঙ্গ–

ক. ধরণীর অঙ্গ হতে বাসরের সজ্জা পড়ে খুলি
('চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রি')

খ. নদীর ওপারে ধু ধু দেখা যায় 'কমিশনারের' চর–
সেও টানিয়াছে বাদলা আঁচল শ্যামল দেহের পর।
('চিঠির জওয়াব')

গ. শোন সখি শোন রিক্ত শাখার কাতর করুণ গীতি
আজি অবেলায় ডাক আসিয়াছে সাজাইতে ছায়াবীথি
একি সখি বল ছল
দখিনা মলয় অহেতুক কেন দিয়ে যায় ব্যথা দোল?
('অধমার মিনতি')

ঘ. চন্দ্রকান্ত-মণি এ জগতে খ্যাত গো কঠোর পাষাণ বলি–
চাঁদের আলোর পরশ লাগিলে সে পাষাণও হায় যায় গো গলি!
('বিজয়িনী')

–উদ্ধৃত প্রতিটি অনুষঙ্গে, বিশেষ কিছু শব্দে নারী-মনস্তত্ব এবং নারী অভিজ্ঞতার ছায়াপাত বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মূলত লিঙ্গভিত্তিক সমাজ। সুফিয়া কামাল লিঙ্গভিত্তিক এই সমাজে অবস্থান করেই নারীর ব্যক্তিজীবনকে দেখতে চেয়েছেন নারীর চোখ দিয়ে, স্বপ্ন দেখেছেন নারী-জাগরণের। তিনি যখন কবিতা লিখেছেন, বাঙ্গালি সমাজে তখন জেন্ডার-সচেতনতা দেখা দেয়নি। সুফিয়া কামাল যে সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, সেখানে নারী-পুরুষের সম্মিলিত ভূমিকাই ছিল তাঁর কাছে প্রত্যাশিত। সম্মিলিত ভূমিকা পালনের জন্য নারীর আত্মবিকাশকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন সুফিয়া কামাল। পৃথিবী জুড়ে নারীর আত্ম-সচেতনতা ও জাগরণের আকাংখা তাঁকে আশান্বিত করেছে এবং উচ্চারণ করেছেন এই অসামান্য পংক্তিমালা–

যুগ যুগ ধরি পেষণের ফলে
গর্জিয়া উঠিছে আজ নারী দলে দলে
বহু নিষ্পেষণে জ্বলে ওঠে দাবানল
পূর্ণিমায় কে রুধিবে জোয়ারের জল!

('আধুনিক কবিতা')

## প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম মল্লিক

# নারীশিক্ষা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

*[প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম মল্লিক এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর একজন স্বনাম ধন্য এবং সুদক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করতেন। লেখালেখিতেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ হাত ছিল তাঁর। গত ১১.০৭.০৯ ইং তারিখ রোজ শনিবার তিনি আমাদের ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁর রুহের প্রতি মাগফেরাত কামনা করি আমরা। উল্লেখ্য, তাঁর এই প্রবন্ধটি তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকার জন্য আমার রুমে এসে আমার* হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এরপর দেখা হলেই জানতে চাইতেন লেখাটি কেমন হয়েছে এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত লেখাটি প্রকাশের ব্যাপারেও আমাকে খুবই অনুপ্রেরণা দিতেন। লেখাটি যখন প্রকাশ হলো তখন আর তিনি নেই। বিশেষভাবে সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর রুহের প্রতি আবারও মাগফেরাত কামনা করছি (সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকা)।]*

ফরাসি সম্রাট নোপোলিয়ন বোনাপার্ট দেশবাসীর কাছে উদাত্ত আহ্বান রেখেছিলেন- "তোমরা আমাকে একটি শিক্ষিতা মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব"। পরিবার, সমাজ ও জাতি বিনির্মাণে একজন শিক্ষিতা মা তথা শিক্ষিতা নারীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেই ঐ বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রনায়ক এ আহ্বান রেখেছিলেন।

যুগ যুগ ধরে নারীরা নানা বঞ্চনার শিকার হয়েছে। দেশ ও সমাজ উন্নয়নে তাদের মেধা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার পর্যাপ্ত সুযোগ এরা পায়নি। নানা সামাজিক অনাচার, কুপমন্ডুকতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষার আবর্তে পড়ে তারা পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছে; মাথাকুটে মরেছে তাদের শক্তি, সামর্থ্য, মর্যাদা ও সম্ভাবনা। সভ্যতার গোড়া থেকেই এ অমানবিক ব্যবস্থা বহাল তবিয়তে চলে আসছে। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সর্বত্রই এ অবিচার অনাচারের কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। নেপোলিয়নের ফ্রান্সও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাই তাঁর মনে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল শিক্ষার আলোতে উদ্ভাসিত একজন আত্মসচেতন মায়ের। নেপোলিয়নের আহ্বান সকল স্থানের সকল বিবেকবান চিন্তাশীল মানুষের দরদী মনেরই অভিব্যক্তি বই কি! আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে, বর্তমান উন্নয়ন ও প্রগতির এ যুগসন্ধিক্ষণে এ কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধাণযোগ্য।

আমাদের দেশ উন্নয়ন, বিকাশ ও সৃষ্টির এক ক্রান্তিকালে এসে উপনীত হয়েছে। জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও গর্বের সাথে বেঁচে থাকার এক অবিনাশী প্রয়াস। এ প্রয়াসকে ধরে রাখতে হলে, দীপ্ত পদভারে সগৌরবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, চাই নারী-পুরুষ উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টা। কারণ, কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি জাতীয় উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রেই একজন আর একজনের পরিপূরক মাত্র। নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নেই। আর যদি উল্টো কিছু হয় তবেই দেখা দেবে পদস্খলন, সামাজিক অস্থিরতা এবং অনিবার্য ধ্বংস।

একথা সত্য, শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে রয়েছে বিরাট তফাৎ। তবে এ ভিন্নতা দু'য়ের অনিবার্য পরিপূরক হিসাবেই স্বীকৃত। একজনের অভাব ও প্রয়োজন আর একজনের দ্বারাই পুষিয়ে নিতে হবে। দু'য়ের মিলনে ও সহজীবন ধারণে ভিন্নতাই অপার আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। এজন্য নারী পুরুষের সম্পর্কের বড় কথা হচ্ছে উভয়ের পরস্পর নির্ভরশীলতা। এ নির্ভরশীলতা ছাড়া সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সম্পর্কহীন হলে নারী-পুরুষের সৃষ্টিরই কোন অর্থ হয় না। মনে রাখতে হবে, একজন আর একজনের উপর অংশতঃ হলেও নির্ভরশীল বলেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠে। এ নির্ভরশীলতা না থাকলে প্রেম, প্রীতি, মহত্ব আত্মত্যাগ সবই যেন অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছাড়া এ সমস্ত মানবিক গুণাবলির বিকাশের কোনই সুযোগ থাকে না। তাই কবি নজরুল উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছেন-

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"।

অতএব, এ কথা স্পষ্টতঃই প্রণিধানযোগ্য যে নারীত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও নারী জীবনের উন্নয়ন ছাড়া প্রকৃত বা সামগ্রিক উন্নয়নের ধারণা বাতুলতা মাত্র।

কিন্তু এ উন্নয়ন আসবে কিভাবে? চিন্তাশীল বিবেকমান মানুষ মনে করেন, নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত, বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার সঞ্জীবনী রসে সিক্ত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েই সম্ভব নারী জীবনের উন্নয়ন। এরূপ শিক্ষাই হবে নারী মুক্তি ও নারী উন্নয়ন আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। তবে নারী জীবনের উন্নয়নের স্বার্থে সম্পৃক্ত ও পরিচ্ছন্ন শিক্ষা বিকাশের পথ ও সুযোগ বড়ই বন্ধুর। কিন্তু জাতীয় কল্যাণের স্বার্থেই একে যে কোন মূল্যে বা ত্যাগের বিনিময়ে সুলভ ও সহজসাধ্য করে তুলতে হবে।

"নারীশিক্ষার উন্নয়ন" কথাটি বলতেই আমাদের মনের মধ্যে উঁকি ঝুকি মারছে দু'টি কথা (ক) নারী শিক্ষার অপরিহার্যতা এবং (খ) এর সামগ্রিক উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব তার প্রক্রিয়া।

বক্ষমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে নারী পুরুষের মিলিত প্রয়াসেই গড়ে উঠে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি। এ ক্ষেত্রে একজন আর একজনেরই পরিপূরক বিশেষ। একজনকে পদদলিত করে আর একজন উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে পারে না। জাতীয় জীবনে আনতে পারে না কোন কল্যাণ বা কঙ্খিত ফল। কাজেই উভয়েরই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সত্যটি আরো প্রকটভাবে অনুভূত।

বাংলাদেশে প্রায় ১৪ কোটি লোকের বাস। আর এ বিরাট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই নারী। মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে শতকরা ৩৭% ভাগ লোক শিক্ষিত, অবশ্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষিত এর চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু নারী শিক্ষার হার মাত্র শতকরা ১৮%। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা ৪৩% ভাগ ছাত্রী এবং এর মধ্যে শুধুমাত্র শতকরা ২৫% ভাগ দশম শ্রেণীর পরীক্ষা পাশ বা অতিক্রম করেছে। আর উপরের দিকের কথা নাই বা বললাম। শুধু এটুকুই বলতে চাই, গোটা জনগোষ্ঠীর এ বিপুল অংশকে শিক্ষিত করে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা না গেলে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও নিরক্ষরতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া নারীরা অধঃমুখী, কুপমন্ডুক এবং জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ। ভাল-মন্দ পরখ করা, উন্নয়ন ও প্রগতিকে উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উন্নয়ন ও প্রগতির স্রোতধারার সাথে সে পরিচিত নয় বিধায় নতুনের অভিযাত্রা তার কাছে অনাকাঙ্খিত এবং কন্টক স্বরূপ মনে হয়। তাই শ্লোগান উঠেছে-

(১) একটি নারী শিক্ষিত হলে একটি পরিবার শিক্ষিত হবে;
(২) একটি পরিবার শিক্ষিত হলে একটি সমাজ শিক্ষিত হবে;
(৩) একটি সমাজ শিক্ষিত হলে একটি দেশ ও জাতি শিক্ষিত হবে।

বস্তুতঃ নারীরূপে মাতাই হচ্ছেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক-যিনি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ, ভালবাসা ও বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান দ্বারা তাঁর সন্তানকে নিজের মতো করে গড়ে তোলেন; পরিবার সমাজ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হয় এ রকম আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা নিয়ে তিনি তাঁর সন্তানকে আদর যত্নে মানুষ করে তোলেন। কাজেই স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে, নারীদেরকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে সত্যিকার অর্থে কোন উন্নয়ন বা প্রগতি অর্জনই সম্ভবপর হবে না।

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশের জনগণ উন্নয়নের এক ক্রান্তিলগ্নে এসে উপনীত হয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের দরকার এক বিপুল সুশিক্ষিত মানব সম্পদ। জাতীয় প্রয়োজনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উন্নয়নের স্রোতধারায় এদের সম্পৃক্ততা আজ তীব্রভাবে অনুভূত। সময়, অবস্থা, রুচি, শরীরবিজ্ঞান অনুযায়ী নারী-পুরুষ উভয়কেই

উপযুক্তভাবে শ্রমকে ভাগ করে নিতে হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা এবং সংযত আচরণের ভিত্তিতেই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্ববান থাকবে, কর্তব্যপরায়ন হবে– এটাই বিবেকের কথা, ধর্মের কথা, চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের কথা। কুরআন চায় না নারী অবরুদ্ধ থাকুক, নারী অশিক্ষিত থাকুক, কুলি-মজুরে পরিণত হোক, প্রদর্শনীর সামগ্রী হোক অথবা শুধুমাত্র ভোগের বস্তু হয়ে, পঙ্গু হয়ে জীবন ধারণ করুক। বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান-নারী পুরুষ উভয়েই তাদের মিলিত প্রয়াস ও প্রেম-প্রীতি ভালবাসায় গড়ে তুলুক আনন্দময় পরিবার, সমাজ ও শান্তিময় ভুবন। কাজেই আজ সময় এসেছে-পাশ্চাত্যে প্রগতির নামে, আর প্রাচ্যে রীতি ও ধর্মের নামে নারীর উপর যে ঘৃণ্য অবিচার চলছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার। মহৎপ্রাণ নারী ও পুরুষ এ বিদ্রোহে হাত মিলিয়ে মর্যাদা, সুখ, শান্তি ও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাক এটাই আজ সময়ের দাবী।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে আসা যাক। কিভাবে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নতি ও প্রগতির অভিযাত্রায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করা যায়? এ ক্ষেত্রে আমার কিছু পরামর্শ রয়েছে-

(১) নারীশিক্ষার উন্নয়নকল্পে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বদিচ্ছা, একনিষ্ঠ ও অবিচল সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

(২) চাই প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। নারীকে দাবিয়ে রাখা, শোষণ করা, অত্যাচার-অনাচারে বেঁধে রাখা এবং অচ্ছুৎ ভাবার মানসিকতা পরিহার করে তাদেরকে সম-মর্যাদায় অভিষিক্ত করার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী-পুরুষ কিভাবে অগ্রসর হলে মানব জাতির শান্তিময় প্রগতি সম্ভব ও সহজ হয় তার সুষ্ঠ ধারণা সকলের মধ্যে প্রোথিত করে দিতে হবে। সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি তথা জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো এ ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৩) নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার নিমিত্তে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকেই ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষার সাথেও তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধর্মীয় ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে নতুন সিলেবাস বা কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে এবং তাকে বাস্তবে রূপদান করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর যারা এ শিক্ষা কর্মসূচিকে সফল ও স্বার্থক করে তুলবেন তাঁরা হবেন নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এক দৃঢ়চেতা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী।

(৪) নারীদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর জীবনভিত্তিক শিক্ষার দ্বার তাদের জন্য উম্মুক্ত করে দিতে হবে। রাষ্ট্রীয়

পৃষ্ঠপোষকতা এবং জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে এ কার্যকে সুনিশ্চিত করতে হবে। তাদের জন্য শিক্ষা হবে অবারিত দ্বার এবং অন্ততঃ স্নাতক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক। শিক্ষাখাতে বর্তমান বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত কোটা ৭% শতাংশে উন্নীত করতে হবে যার নিশ্চিত সুফল নারীরাও ভোগ করবে।

(৫) নারী শিক্ষার উন্নয়নে "বিশেষ এ্যাকশন প্ল্যান বা বালিকা দশক কর্ম পরিকল্পনা" বাস্তবায়ন করতে হবে। এ কর্ম পরিকল্পনায় থাকবে বাংলাদেশে বালিকা শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং তাদের বেঁচে থাকা ও নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। নির্যাতিত পতিতা বালিকারা এ "এ্যাকশন প্ল্যান" এর আওতাধীন থাকবে।

এ সরকারের বিগত আমলে "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ও মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সকল ছাত্রীর জন্য বিনাবেতনে অধ্যয়ন এবং আর্থিক সাহায্য হিসেবে উপ-বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমানে এ উপবৃত্তি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত বৈদেশিক সাড়ার অভাব এবং বাস্তবতার নিরিখে "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচির পদযাত্রা ব্যহত হলেও উপবৃত্তির কর্মসূচি চালু রয়েছে এবং এর অগ্রযাত্রা ও গ্রাহ্যতা ইতিমধ্যেই সর্বমহলে বিপুল সাড়া যুগিয়েছে। বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার হার ১৮ ভাগ থেকে ২৫ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব আর্থিক সংস্থানে ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে চালুকৃত ৬২৬ কোটি টাকার "জাতীয় ভিত্তিক ছাত্রী উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফ কর্মসূচি" ৩টি আলাদা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পি. আই. ইউ)-এর মাধ্যমে বাস্ত বায়ন করা হচ্ছে। উক্ত ৩টি প্রকল্প ছাড়াও নোরাড-এর অর্থায়নে "ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট" নামক অপর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে "উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম বেসরকারি সংস্থা (ঘএঙ) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক কথায়, উল্লিখিত ৪টি প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি বিতরণ এবং ছাত্রীদের মাসিক বেতন বাবদ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকির অর্থ প্রদান কার্যক্রমে অগ্রণী, জনতা ও রূপালী-এ ৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পৃক্ত রয়েছে। উপবৃত্তি প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ঐ ৩টি ব্যাংক "অভিন্ন তথ্য ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি" অনুসরণ করছে।

বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তি কার্যক্রমের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ-

(১) ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি;

(২) এস. এস. সি পাশ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, এন. জি. ও কর্মী হিসাবে নিয়োগ লাভ এবং স্ব-কর্ম সংস্থানের সুযোগ লাভ করা;

(৩) বাল্য বিবাহ রোধ করার লক্ষ্যে অধ্যয়নে ধরে রাখা।

**দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য সমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ-**

(১) শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

(২) মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করা।

(৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে মহিলাদেরকে সচেতন করা এবং তাদেরকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞানদান করা।

(৪) স্কুল ত্যাগী ছাত্রীদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করত; আয়ের উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা।

এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর্থিক সহায়তা প্রদান করতঃ ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধিই এ কর্মসূচির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধি করাও আলোচ্য কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি শতকরা ৭৫% ভাগ হতে হবে এবং বার্ষিক পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৪৫% নম্বর পেতে হবে।

সরকারের "ছাত্রী বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তি কর্মসূচি" ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যার ফলশ্রুতিতে সরকার এ কর্মসূচিকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছেন। আর এর বাস্তব রূপদান হবে নারী শিক্ষা উন্নয়নের পথে আর এক ধাপ অগ্রগতি।

(৫) নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শক্ত প্রশাসন যন্ত্র অন্যতম পূর্বশর্ত। কঠোর নিরাপত্তা আইন প্রণয়নও কার্যকর করা না গেলে মেয়েদের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত হবে না। মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের কবলে পড়ে সমাজ দেহ ইতোমধ্যেই ক্ষত-বিক্ষত। কাজেই এদেরকে সমুচিত শাস্তি না দিতে পারলে বা না দিলে মেয়েদের ইজ্জত, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যেমন বিঘ্নিত হবে, তেমনি ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবে এদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযোগী পরিবেশ এবং শিক্ষক-অভিভাবক ও রাষ্ট্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

(৬) নারী শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে সহ-শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে, বিশেষ করে 'টিনএইজ' পর্যায়ে। অবাধ চলাফেরা এবং মেলামেশার সুযোগ অনেক সময়েই তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। পর্যায়ক্রমে মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যাপীঠ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। তাদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ হবে নিরুপদ্রব, স্বচ্ছন্দ, সুরুচিপূর্ণ এবং অনৈতিকতা বিবর্জিত।

(৭)

(ক) জাতিসংঘের "সব ধরনের নারী বৈষম্য দুরীকরণ চুক্তি" (ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঃযব ঊষরসরহধঃরড়হ ড়ভ ধষষ ভড়ৎসং ড়ভ উরংপৎরসরহধঃরড়হ ধমধরহংঃ ডড়সবহ) এর ৩য় পরিচ্ছেদ এর ১০ ধারার সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করে বলতে চাই, শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে মফস্বল বা শহর এলাকার সব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী অর্জন, পড়াশুনা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং জীবন গড়ার সম ব্যবস্থাদি থাকতে হবে; এ সমতা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাধারণ, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, উচ্চকারিগরি শিক্ষার তথা সব ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি মেয়েদের একই সিলেবাস, একই ধরনের পরীক্ষা, একই মানের শিক্ষকমন্ডলী, একই মানসম্পন্ন শিক্ষাঙ্গনের সুযোগ এবং একই শিক্ষা-সরঞ্জাম থাকতে হবে।

(গ) বয়স্ক শিক্ষা প্রোগ্রামসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ। বিশেষ করে সব শিক্ষা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ যা নারী পুরুষের মাঝে শিক্ষা ব্যবধান ঘুচাতে হাতে নেয়া হয়েছে।

(ঘ) চাকুরীর সুযোগ সুবিধা এবং পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীদেরকেও একই অধিকার প্রদান করতে হবে।

(৯) নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে নারীর বিপুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে কোটা বেঁধে দিতে হবে। শিক্ষকতা, বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যায়গুলোতে, নার্সিং পেশা ও গার্মেন্টস শিল্পে তাদের একচেটিয়া কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(১০) নারীদের জন্য বিপুল পরিমাণে আত্ম-কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। নানা ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ তাদের জন্য সহজলভ্য করে দিতে হবে এবং তাদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ, সরঞ্জাম উপকরণাদি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ভিক্ষুকের হাতকে কর্মের হাতে পরিণত করতে হবে; এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যকে বাজারজাত করণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১১) বিপ্লব নারী জাগরণের স্বার্থে মহিলা মন্ত্রণালয়, মহিলা সংস্থা, মহিলা অধিদপ্তর, যুব মন্ত্রণালয় ও যুব অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরকে আরো সক্রিয় ও গতিশীল করে তুলতে হবে। তাদেরকে উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা, নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার, নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে আরো সমন্বিত কর্ম প্রয়াস ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(১২) নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে যাতে করে নারীশিক্ষা উন্নয়নের কার্যক্রম ব্যহত বা বাঁধাগ্রস্ত না হয় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(১৩) নারীশিক্ষা বিস্তারে এন.জি.ও দের ভূমিকাকে সতর্কতার সাথে স্বীকৃতি দিতে হবে, এ ব্যাপারে সরকারকে যথেষ্ট সাবধানী হতে হবে যাতে করে সেবার অন্ত রালে তারা কোন রাজনৈতিক চরিতার্থ করতে সাহসী না হয়। বাংলাদেশে বিশ হাজারের অধিক বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক সংস্থা শিক্ষাবিস্তারে নিয়োজিত আছে। এরা শিশু কিশোর ও বয়স্ক লোককে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাক্ষরতা দান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে শতকরা ৭০% থেকে ৭৫% ভাগই মেয়ে। অনেক সংস্থা যেমন (ঈযৎরংঃরধহ পড়সসরংংরড়হ ভড়ৎ উবাবষড়ঢ়সবহঃ রহ ইধহমষধফবংয (ঈ. উ. উ. ই.), আশা, গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে আয় সৃষ্টিকারী দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান, ঋণ প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাক্ষরতা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের কার্যক্রম বিশাল আকারের এবং এ সংস্থা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে।

(১৪) সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ললিতকলা, প্রগতি ও পারিবারিক জীবনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে নারীদেরকে আত্ম-সচেতন থাকতে হবে। চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে বা স্বস্তা শ্লোগানে গা ভাসিয়ে দিয়ে অথবা নিজেকে অতিমাত্রায় উম্মোচন করে দিয়ে নারী জীবনের সত্যিকারের অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। তাদেরকে হতে হবে সংযত, বাস্তবমুখী, আত্ম-মর্যাদাশীল এবং পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।

পরিশেষে চাই, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও বঞ্চনার যাতাকলে নিস্পিষ্ট বাংলাদেশের নারীসমাজ শিক্ষিত হবে, স্বাবলম্বী হবে, পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ভোগ করবে, মানুষের মতো মানুষ হয়ে দেশ ও সমাজের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেবে-এটাই হবে আজকে আমাদের ঐকান্তিক কামনা। সত্যিকার শিক্ষার সঙ্গে নারী তার নিজের শক্তি, মেধা ও প্রজ্ঞাকে যোগ করতে পারলেই তবে আসবে সামগ্রিক কল্যাণ, আসবে শান্তি ও প্রগতি।

কাজেই বেগম রোকেয়া, শামসুন্নাহার, নবাব ফয়জুন্নেসা, জোঁয়াস দ্য আর্ক ও মাদার তেরেসার মতো আমরাও চাই বিপ্লবী নারী জাগরণ।

## ড. সৈয়দা মোতাহেরা বানু

# সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিশুসাহিত্য

কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে ইংরেজী ১৮৮২ এবং বাংলা ১২৮৮ মাঘ মাসে মাতুলালয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) জন্ম। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে। পিতামহ অক্ষয় কুমারদত্ত ছিলেন তত্ত্ববোধিণী পত্রিকা'র সম্পাদক এবং পিতা রজনীনাথ দত্ত কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। বি.এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে পিতার ব্যবসার কাজে মনোনিবেশ করেন। পরে ব্যবসা পরিত্যাগ করে কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইংরেজী ফরাসি ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা বঙ্গানুবাদ করে বাংলাসাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেন।

রসিক পুরুষ সত্যেন্দ্রনাথ মৌখিক কথাবার্তায় যেমন (চিঠিপত্র পড়ে জানা যায়) পত্রাদিতেও তেমনি ছড়া কাটতে ভালবাসতেন। যেমন পত্রের শেষে,

আমার সম্মান নিত্য<br>
হইতে বিশ্বাসী ভৃত্য

তাঁর এই অভ্যাস পোপ-এর জীবনের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইংরেজ কবি পোপ কবিতা রচনার অভ্যাসের জন্য পিতার কাছে প্রহার খেয়েও বলেছিলেন," চধঢ়ধ চধঢ়ধ ঢ়রঞ্ছং ঃধশত্র ও ংযধষষ হবাবৎ ।বৎংবং সধশব.চ বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার অধিকাংশ কবি রবি প্রদক্ষিণ করেই জ্যোতিঃ বিকিরণ করছিলেন। রবীন্দ্রযুগের এবং রবীন্দ্রভক্ত কবি হয়েও নানা গুণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অরূপ আধ্যাত্মিক লোক থেকে সরে এসে তিনি জীবনধর্মী সাহিত্য রচনা করলেন। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) উত্তাপ ও স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুতে, কবিতার ছন্দ নির্মাণের কৌশলে এবং শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কারুকার্যে। কল্পনা এবং হৃদয়াবেগকে পরিহার করে জ্ঞানচর্চাকে কবিত্ব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দেশাত্মবোধ, শক্তির সাধনা ও মানবতার বন্দনা তাঁর কবিতার ভাববস্তু। সমাজের তুচ্ছ মানুষকে নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। শিশুতোষ রচনাও এর ব্যতিক্রম নয়।

**প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ** সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৯০৬), হোম শিখা (১৯০৭), তীর্থ-সলিল (১৯০৮), তীর্থ-রেণু (১৯১০), মণি-মঞ্জুষা (১৯১৫), ফুলের ফসল (১৯১১), কুহু ও কেকা (১৯১২), তুলির লিখন (১৯১৪), অভ্র আবীর (১৯১৭), বেলা শেষের গান (১৯২৩), সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা (১৩৫২,১৯৫৪)।

এইসব কাব্যগ্রন্থে তাঁর শিশু-রচনাসমূহ ছড়িয়ে আছে। একমাত্র 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা' শিশু-কবিতার সঙ্কলন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতা লিখেছেন নানা বিষয় নিয়ে। শিশুদের জন্য লিখেছেন ছড়া, কবিতা, ধাঁধা। তিনি শিশুসাহিত্যিক নন, কিন্তু তাঁর বেশ কিছু কবিতায় শিশুপ্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতার শ্রেণীকরণ,

বাৎসল্য রসের কবিতা ঃ 'শিশুর স্বপ্নাশ্রু', 'অন্ধ শিশু', 'শিশুর স্বপ্নাশ্রয়', শিশুর আশ্রয় (বেণু ও বীণা) 'শিশুহীন পুরী,' (বিদায় আরতি), 'সন্তানক'(অভ্র-আবীর), 'নতুন মানুষ', 'প্রথম হাসি' (কুহু ও কেকা) 'বাজশ্রবা' 'কয়াধূ', 'গিরিরাণী' (অনার্য্যা) 'সুশ্বেতা', অরুন্ধতি, ভীমজননী (বেলা শেষের গান), নেই ঘরের ঘুমপাড়ানী, প্রথমগালি, মৌলিকগালি (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা) ইত্যাদি।

**কৌতূহলোদ্দীপক ঃ** রং মশাল (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা)ইত্যাদি।
ছড়ার সুরের ঝংকার ঃ 'পাল্কীর গান' (কুহু ও কেকা), 'দূরের পাল্লা', জ্যৈষ্ঠী মধু' (বিদায় আরতি), 'শিল্' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা) ইত্যাদি।

**ধ্বনিঝংকারমূলক কবিতা ঃ** 'ঝর্ণা' ইত্যাদি।
চিত্র সৌন্দর্য ঃ পাল্কীর গান (কুহু ও কেকা), দূরের পাল্লা (বিদায়-আরতি) ইত্যাদি।

**মনোরঞ্জনমূলক কবিতা ঃ** ইলিশ মাছ, তাতারসির গান, রেলগাড়ির গান (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা) ইত্যাদি।

**আমোদমূলক ঃ** 'গলার তোয়াজ' ইত্যাদি।

**প্রকৃতি বিষয়ক তথা শিক্ষামূলক ঃ** শীতের ফুল, বসন্তের ফুল, শরতের ফুল (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা) এ শিশুরা প্রকৃতির পাঠ পেয়েছে। শিশু শিক্ষার উপাদানও এতে রয়েছে।

**লোভের বস্তু নিয়ে লেখা ঃ** ইলিশ মাছ, তাতারসির গান (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা) ইত্যাদি।

**ছেলে ভুলানো ছড়া** ঃ রেলগাড়ির গান (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা) ইত্যাদি।
মানবতার কবিতা বা সমদৃষ্টির পরিচয়-সাম্যসাম (সবিতা), জাতির পাঁতি,
মেথর, শুদ্র, বিশ্বকর্মা (বেণু ও বীণা) ইত্যাদি।

**কিশোর বন্দনা ঃ** রংমশাল, ধাঁধা, 'পদ্মকোষের বজ্রমণি', ধ্রুব সুমঙ্গল, ছেলের দল'(সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা)।

**খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা ঃ** 'পেটুকের বর্ণ-পরিচয়' (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা) ইত্যাদি।

**আদর্শবাদী ঃ** লাজের কাহিনী ইত্যাদি।

**প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যঃ** তাতারসির গান (সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা)।

পল্লীর চিত্র– পাল্কীর গান(কুহু ও কেকা), দূরের পাল্লা(বিদায়-আরতি) ।
তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্য পুস্তিকা 'সবিতা' (১৯০০)। গ্রন্থের শেষ কবিতা 'সাম্যসাম' বিশ শতকের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রথম সাম্যের মন্ত্র সোচ্চারভাবে ঘোষিত হয়,

মানি না গির্জা, মঠ মন্দির, কলকি পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য দেবতা অন্তরে তার ঘর;

জীবন-গাথা, সাম্যবাদী ও সর্বহারা সমষ্টির পূর্বসূরী 'সাম্য-সাম' বাংলায় প্রথম গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী চেতনা রঞ্জিত কবিতা।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন পর্বে তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫) ও 'বেণু ও বীণাতে'ও (১৯০৬) সমসাময়িক ঘটনাবলী আবেগের সঞ্চার করেছে এবং সংস্কৃত ভাষার বন্ধনজাল থেকে বাংলাভাষাকে মুক্তি দেবার ক্ষেত্রে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং সরল ভাষা ব্যবহারের প্রতিও তাঁর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে 'সবুজ পত্র' (১৩২১) প্রতিষ্ঠার কালে ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষার মুক্তি আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছিলেন।

শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সামান্য হলেও এই সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনি বাস্তববাদিতার পরিচয় দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক কাব্যগ্রন্থে শিশুতোষ কবিতা রচনায় বাৎসল্য রসের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃতির অফুরন্ত দানের মধ্যে অভাব কেবল একজন শিশুর উপস্থিতি। কবির উপলব্ধি হল এ পরিবেশে কেবল শিশুর উপস্থিতিই প্রকৃতিকে পূর্ণতর করে তুলতে পারত। 'শিশুহীন পুরী'(বেণু ও বীণা) তে তিনি বলেন,

বিজন এ পুরি শিশুর অভাবে
কে যেন জীবন লয়েছে কাড়ি
হরষ বিষাদ নাহি যেন আর
পুলক দেবতা গিয়াছে ছাড়ি।

কেবল শিশু নেই বলে, শিশুর হাসি নেই বলে সর্বত্র ব্যর্থতা বিরাজমান, কোনো জীবন নেই, আনন্দ ছেড়ে চলে গেছে। কবির নিকট শিশু জীবনের ও আনন্দের সমার্থক, সুতরাং শিশুর অনুপস্থিতি বিপরীত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। শিশুর 'প্রথম হাসির ধ্বনি' কবির কাছে বোধহয় যেন 'ফুলঝুরিতে ফুল্‌কি হাসির রাশি'– যেন 'রুপোর ঘুঙুর জড়িয়ে হাতে বাজায় কে খঞ্জনী'।

'প্রকৃতিতে শিশু মহাবাণী বয়ে আনে তার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা বা ভেদাভেদের জ্ঞান নেই। শিশুর সরল সৌন্দর্য হিংসা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তির বার্তা নিয়ে আসে'[২]। বিশ

শতকের প্রথম দশকে বাংলাকাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই একমাত্র অনুবাদ-ক্ষেত্রে যথার্থ সিদ্ধহস্তের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। বাংলাসাহিত্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ আনার উদ্দেশ্যে এবং দেশ-বিদেশের কবিতার ভাব-প্রবাহের সঙ্গে বাঙ্গালির পরিচয় করাতে তিনি অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। তিনি মূলের রস গ্রহণ করেছিলেন-এ কারণে এগুলো তাঁর মৌলিক সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। তিনি অনুবাদকে রসের সামগ্রী করেছেন-যা মানুষের কল্পনাকে জাগ্রত করে, মানুষের মনে সুন্দরের সৃষ্টি করে।

'তীর্থ-সলিল' (১৯০৮), 'তীর্থ-রেণু', (১৯১০) ও 'মণি-মঞ্জুষা', (১৯১৫) বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট কবিগোষ্ঠির কাব্যসম্ভারের পরিচ্ছন্ন ও সুললিত বঙ্গানুবাদ। 'তীর্থ-সলিল' (জাপানী) 'ঘুম-পাড়ানি' 'দু-দিনের শিশু', 'মাউরি জাতির ঘুম-পাড়ানি' (অষ্ট্রেলিয়া), 'শিশু', 'শিশু-কন্দর্পের শান্তি' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অনুবাদ শিশু কবিতা। 'মাউরি জাতির ঘুম পাড়ানি'র দৃষ্টান্ত,

খোকা আমার, খোকা আমার, 'তুল তুলসী'র পাতা!
বেনামূলের গুচ্ছ আমায় রাখ্ রে বুকে মাথা!
মৃগনাভির কৌটা আমার খোকা ঘুম যায়,
গুগ্‌গুলু ধুপ-ধুনার আবেশ খোকার চোখে আয়!

তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ 'তীর্থ রেণু'(১৯১০) পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেন, "তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি–আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে–ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য।"[৩]
আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 'ঘুম পাড়ানী গান', কবিতায় ভাষার রীতি বা ইডিয়মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মানৎ মেনে আপদ বালাই করবো আমি ক্ষয়'

অন্যত্র 'ঘুম-ভাঙা' কবিতায়,

কে বেড়াবে হামা দিয়ে
কে বেড়াবে দাওয়ায়,
কে খেল্‌বে ধুলো নিয়ে
ছাঁচতলাটির ছাওয়ায়!

'বঙ্গবাসী' পত্রিকা তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে বলেন, "একাধারে জ্ঞান, বিদ্যা, গবেষণা, ভাব, সুষমা, প্রভৃতির পূর্ণ পরিচয়।"[৪]

'বেণু ও বীণা'(১৯০৬), 'হোম শিখা'(১৯০৭), 'ফুলের ফসল'(১৯১১), 'কুহু ও কেকা'(১৯১২), 'তুলির লিখন'(১৯১৪), 'অভ্র-আবীর'(১৯১৭) অনুবাদ ক্যাব্যগ্রন্থ। 'উত্তম অধম', 'নেই ঘরের ঘুমপাড়ানী' তাঁর অনুবাদমূলক বাৎসল্য রসের কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথ যুগসচেতন কবি ছিলেন। মানুষের সূখ-দুঃখ, হাসিকান্নার জগত তাঁকে আকৃষ্ট করেছে প্রবলভাবে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে মৌলিক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে, 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'তুলির লিখন' (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থে। ঐ সময়ে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনাকে জাগ্রত কওে। 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) কাব্যগ্রন্থের 'মেথর' কবিতাতে সমাজে পতিতাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে এর সাথে নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতার সাদৃশ্য অনেক সমালোচক লক্ষ্য করেছেন। মাতুলের বালিকা কন্যার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন–'কুহু ও কেকা'(১৯১২)র শিশু মৃত্যুবিষয়ক কবিতাগুলি এই ঘটনা উপলক্ষে লেখা। এগুলির বেদনা করুণ মর্মান্তিক। 'তুলির লিখন' (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থের 'পরেয়া' কবিতায় হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। 'অভ্র আবীর' (১৯১৭) কাব্যগ্রন্থের 'জাতির পাঁতি' কবিতায় জগৎ জুড়ে এক জাতি মানুষ জাতির স্বপ্ন দেখেছেন, এ কবিতাগুলো মহাযুদ্ধের সময়কার। 'জাতির পাঁতি' কবিতায় লিখেছেন,

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।

পরবর্তীকালে নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাসমষ্টিতে ঐ একই আদর্শের পরিচর্যা অনেক সমালোচক লক্ষ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এ সাম্যচেতনা সাধারণ মানবিকবোধ থেকে উৎসারিত, অর্থনৈতিক শ্রেণীচেতনা থেকে নয়।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ছোটদের আহ্বান' কবিতায় বলেন,

যারা ছোট আছ এস মানুষের মাঝে
মজবুত নও, তবুও লাগিবে কাজে...

এ কবিতায় শিশুর সার্বজনীনতা স্বীকৃত তেমনি শিশুর স্বাতন্ত্র্যও সেভাবে গৃহীত। শিশুর মধ্যে সম্প্রদায় পরিচয়ের পার্থক্য নেই এবং কবি শিশুকে পরিণত মানুষের মাঝে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি শিশুদের সমাজ সচেতন এবং দায়িত্ববান হিসাবে উপলব্ধি করেছেন।

রবিভক্ত কবি হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল জগৎ ও জীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৌলিক পার্থক্য দৃশ্যমান। সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা বস্তু ও তথ্যকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের মতো বিমূর্ত বা অপ্রত্যক্ষ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সাধনার বৈশিষ্ট্য সত্যেন্দ্র সমালোচক হরপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন, "খাঁটি বাংলা ভাষা ও ছন্দের প্রতি আগ্রহ, তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম ও বিদেশী শব্দের বহুল ব্যবহার, তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান এবং বিশেষভাবে স্বরাঘাত প্রধান ছন্দের নৈপুণ্য

ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক, এবং সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ চিন্তা, গীতি কবিতার প্রকারগত বৈচিত্রেরও রূপগত কৌশলের প্রয়াস, মিলের বিচিত্রতা, শব্দের অভিনবত্ব, চিত্রকল্পের কৌশল, রবীন্দ্রযুগের একান্ত রবীন্দ্রভক্ত কবি হয়েও প্রাচীন ক্লাসিক্যাল কাব্যাদর্শের প্রতি অনুরাগ–এইগুলি তাঁর কাব্যসাধনার বিশিষ্ট লক্ষণ। এছাড়া অনুবাদকের অক্লান্ত অধ্যবসায় ছিলো তাঁর স্বভাবের বিশেষত্ব এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাহিত্য পর্যালোকের দৃষ্টি, বৈয়াকরণের শব্দজ্ঞান, ছান্দসিকের সৌষমচিন্তা।"[৬]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনেক শিশু কবিতা লিখেছেন। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা এই সব কবিতার সংকলন 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা'। 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা' শিশুরঞ্জক কবিতার সঙ্কলন। দুপুর বেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে থাকার পরিবর্তে শিশুদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, গ্রন্থভুক্ত 'মৌচাক' কবিতায়,

ঝরছেরে মৌচাকের মধু
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায়,
দাওয়ায় ব'সে ভাবিস কি আর
আয়রে তোরা বেরিয়ে আয়।

শিশুরঞ্জক অপর কবিতা 'পেটুকের বর্ণ পরিচয়'। তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের পরিচয় 'টপ্‌টপাটপ্', 'ঢ্যাড়শ-কি-তরকারি', 'নবডঙ্কা', 'হাপুৎ হুপুৎ হপ্' ইত্যাদি শব্দে কিশোরসুলভ ভাব পরিস্ফুট হয়েছে। হাস্যরসের কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথ (কল্পনা) ও দ্বিজেন্দ্রলালকে অনুসরণ করেছেন। মহৎভাবের কবিতার অনুকরণে হাস্যরস সৃষ্টির উদাহরণ সত্যেন্দ্রনাথের ভোজনবিলাস বিষয়ক রঙ্গরসের কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়।

খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন 'পেটুকের বর্ণ পরিচয়', প্রকৃতপক্ষে শিশুদের বাংলা বর্ণমালা শিক্ষাদানের প্রয়াস। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' শেখার সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকতে পারে যা সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন কবিতায়। বাংলা বর্ণমালায় মূর্দ্ধণ্য-ণ ও মূর্দ্ধণ্য-ষ-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃতরূপে তাঁর মত ব্যক্ত হয়েছে,

দূর থেকে মূর্দ্ধণ্য ণ-এ প্রণাম ক'রে সারি।
কৃপণ ওটা ওর ঘরে ভাই মিলবে নাকো কিছু,
আস্ত নবডঙ্কা ওটা যাস্‌নে পিছু পিছু।'

এবং

সর্ষের ফুল দেখায় কেবল মূর্দ্ধণ্য ষ–য়ে।'

'খেলোয়াড় দলে'র গুণগাথায় কবি কিশোর উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'হন্টন', 'এস্পোট', 'ক্যাচ্ অ্যাজ-ক্যাচ্-ক্যান্' এই সব শব্দে কিশোরদের একচেটিয়া অধিকার। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় স্থান পেয়ে এই শব্দগুলি কবিতাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহৃত হবার যোগ্যতাও প্রমাণ করেছে।

'পাল্কীর গান' প্রথমে 'সন্দেশ'(১৯১৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা'য় সঙ্কলিত হয়। 'পাল্কীর গান', 'দূরের পাল্লা', 'জ্যৈষ্ঠীমধু', 'শিল' প্রভৃতি প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায় চিত্রসৌন্দর্য প্রধান হয়ে উঠেছে। এসব কবিতায় খন্ডচিত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়ে পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোসাধনায় শুধু সঙ্গীত নয়, চিত্রনির্মাণসুলভ গুণ লক্ষ করে অজিতকুমার চক্রবর্তী পল ভার্লেন সম্বন্ধে প্রযুক্ত একটি উক্তি আলোচ্য কবি সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন– 'যব ঢ়ধরহঃং রিঃয ংড়ঁহস্থ.

'পাল্কীর গানে' পল্লী জীবনের প্রাণময় জীবনের সহজ আনন্দের মুগ্ধতা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু। প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সাধারণতঃ তিনি কোন গভীর তত্ত্বকে রূপ দেননি। বাইরের সৌন্দর্যই তাঁর এসব কবিতার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্যকে কাব্যে ধরে রাখতে হলে যে-পরিমাণ চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা চাই, সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় তা প্রচুর ছিল। 'পাল্কীর গানে',

প্রজাপতি
হলুদ বরণ,–
শশার ফলে
রাখছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে?–
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে;
এঁটো হাতেই,
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় একটা চেনা, একটা অন্তরঙ্গ বাংলাদেশ আছে। তার লতাপাতায় পাখী, তার মেঘ ও আকাশ খুশীর রঙে রাঙা। বাংলার মাটি আর বাংলার জলকে তিনি চিনিয়েছেন। বাংলার লুপ্ত শ্যামশ্রী কবিতায় এনেছেন। কবির চোখে বাংলার পল্লী-প্রকৃতি একটা মায়ার অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে। পল্লীকে তিনি 'আন্ গগনের আলো'য় উদ্ভাসিত দেখেছেন। পল্লীর বিচিত্র ছবি কবির চিত্তে আনন্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। সেই আনন্দে বাংলার মাঠ-ঘাট-বাটকে তিনি একটা প্রীতিস্বপ্নময় কবিতার দেশে পরিণত করেছেন। পল্লীর ছোট ছোট জিনিসকে ঘিরে

কবির কৌতূহলের দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে। এছাড়া পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রকাশ তাঁর নানা কাব্যে ছড়িয়ে আছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে ভাব-প্রকাশের নিদর্শন 'শিল্' কবিতায় রয়েছে, "কঁড়োমড়ো রব যেন উড়ের বুলি!"

'তাতারসির গানে'ও পল্লীপ্রকৃতি ছড়িয়ে আছে, তবে শিশুর প্রাণে স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে গৌরববোধ জাগিয়ে তুলবার উপকরণ এই কবিতায় অধিকভাবে দৃশ্যমান। আনন্দোৎসবের কথার মধ্যেও বঙ্গের গৌরবের কথা কীর্তিত হয়েছে। গৌড়েই প্রথম রসের ভিয়ান হয়েছিল–তারই থেকে মিশর আর চীনে 'মিশ্রী' আর চিনির উদ্ভব। শেষ স্তবকে কবি বলেছেন,

রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি।
রসের ভিয়ান্ হেথায় সুরু
মধুর রসের আমরা গুরু,
--- --- --- --- ---
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী।

আলোচ্য কবিতায় বিগত অতীতকে পুনর্জাগ্রত করবার প্রয়াস লক্ষণীয়। প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি আদর্শ অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছেন। তাঁর কবিতায় অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা সেতু রচনার প্রয়াস দেখা যায়। অর্বাচীন পুরাণ থেকে বেদের কাল পর্যন্ত কবি তাঁর দৃষ্টিকে করেছেন প্রসারিত। প্রাচীন যুগের রহস্যময়তার মধ্যে পরিক্রমা করে তিনি পেয়েছেন আনন্দ। আবার লৌকিক সুখদুখের বাস্তবতায় নেমে এসে কবি খুঁজে পেয়েছেন অপার শান্তি। প্রত্যক্ষ জগৎ এবং সুস্পষ্ট চিন্তাই তাঁকে বেশি করে আকৃষ্ট করেছে।

গ্রন্থের 'মৌলিক গালি'তে দিদির উপর প্রথম অভিমানে অতি দুঃখে সরল, কলহ অনভিজ্ঞ শিশু গালি দেয় 'ডিডি! টুমি টুই'।

কিশোরদের জন্য লেখা কবিতাগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আবেগপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'রংমশাল' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বালকের মতো কৌতুহলী হয়ে উঠতে দেখা যায়। ঠিক-দুপুরের আগুন হাওয়ায় কবি তাঁর বালক বন্ধুদের সঙ্গে 'কঞ্চিহাতে' ছুটেছেন কিশোরজীবনের 'চাকভাঙ্গা মধুর' সন্ধানে।

শিশু ও কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেসব কবিতা লিখেছেন, তার বেশীর ভাগ ছড়া জাতীয়। কিন্তু ভাবের দিক থেকে সেগুলোর ভিন্নতা রয়েছে। গ্রন্থের 'রেলগাড়ির গান' কবিতায় রেলগাড়ির গতির ছন্দে মিলানো যে টুক্‌রো

দৃশ্যগুলি ধরে রাখা হয়েছে, তার বিস্ময় মেশানো ভাষা ছেলে মানুষেরই মুখের ভাষা। সে ভাষার দৃষ্টান্ত,

একি! একি! একি দেখি! ঢেঁকি ঢেঁকি ভাই
ঘোড়া-চুলো গাছগুলো ছোটে বাঁই বাঁই
উঁকি মেরে ঝাৎ ক'রে
স'রে যায় সাঁৎ ক'রে
দেখি ঘাড় কাৎ ক'রে– নাই আর নাই

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কিছু কবিতা স্বপ্নলোকের ভান্ডার, মনোরম চিত্রশালা, ইন্দ্রজালের রাজ্য–যেন রূপকথার মায়াজগৎ। সে সব কবিতায় আছে শুধু রঙের পর রঙ, মোহের উপর মোহ, নানারঙের সন্ধ্যেবেলার খেলা। সেখানে পরীর গান, স্নেহের মায়া। কবির স্বপ্নমুগ্ধ দৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় আয়ারল্যান্ডের কবি ইয়েট্সকে। ইয়েট্স যেমন আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন গাথা ও কাহিনীর অনুরাগী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও তেমনি বাংলাদেশের প্রাচীন রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়া ও গাথার স্বপ্নাচ্ছন্ন জগতের ভক্ত ছিলেন। রূপকথা ও ব্রতকথার ইন্দ্রজাল তাঁর অনেক কবিতার বিষয়বস্তু, 'দূরের পাল্লা' কবিতায়–

পাড়াময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,–জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।
কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

বাংলা ভাষার ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কারিগরী দক্ষতা দেখিয়েছেন বিচিত্রভঙ্গী এনেছেন। নানা বিদেশী ছন্দ–ইংরাজী, গ্রীক, ইতালিয়ান, স্কচ, ফরাসী, জাপানী, জার্মান ছন্দের সুর, সংস্কৃত জটিল ছন্দের সুর বাঙলায় তিনিই আমদানী করেন। বাংলা স্বরমাত্রিক ছন্দে বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন এবং একই কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের দ্বিতল, ত্রিতল, চতুর্দল-চতুষ্কলামাত্রিক ছন্দ ঝংকারে সমৃদ্ধির কারণে 'ছন্দের রাজা' ও 'ছন্দের যাদুকর', 'ছন্দ সরস্বতীর বরপুত্র' ইত্যাদি বলে খ্যাত হন।
'ছেলের দল' কবিতায় কিশোরদের বন্দনা গেয়েছেন। কারণ তারা আমাদের 'আশার খনি'। তারুণ্যের শক্তিতে এরা সব সাধন করতে পারে-যেন 'আলাদিনের মায়া-প্রদীপ'। এদের মধ্যে যে সোনা আছে, তা নিখাদ'। এরা 'পদ্মকোষের বজ্রমণি' এবং 'ধ্রুব সুমঙ্গল'। 'পাল্কীর গান' 'দূরের পাল্লা', 'ইলশে গুঁড়ি' প্রভৃতি কবিতায় ছন্দোলিপি রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছবি দেখার চোখ জাগ্রত রেখেছিলেন, 'ইলশে

গুঁড়ি' প্রথমে 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে 'সতেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা'র অন্তর্ভূক্ত হয়।

ইলশে গুঁড়ি! ইলশে গুঁড়ি!
ইলিশ মাছের ডিম।
ইলশে গুঁড়ি! ইলশে গুঁড়ি,
দিনের বেলায় হিম।
কেয়া ফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আল্‌তা-পাটি শিম্‌
ইল্‌শে গুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি
রোদ্দুরে রিম্‌ ঝিম্‌–

খাঁটি বাংলা ভাষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে মুখের ভাষায় প্রচলিত দেশী-বিদেশী নানা শব্দকে সাহিত্যের ভাষায় প্রতিষ্ঠা করে ভাষাকে জোরালো করবার আদর্শ স্থাপন। শব্দচয়নে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অগণিত খাঁটি দেশী শব্দ সেই সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দ কবিতায় ব্যবহার করে বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ এবং বুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন শিশু-কবিতায়, 'বসন্তের ফুল' কবিতায় মাসতুত, পিসতুত ইত্যাদি সম্বন্ধসূচক শব্দ থেকে 'ফুলতুতো', 'শরতের ফুল' কবিতায় 'লতাতো', 'গাছতুতো' ইত্যাদি শব্দের উদ্ভাবন করেছেন।

বালকদের আমোদ দিয়ে লেখা 'গলার তোয়াজে' কবি কিশোরদের চিত্তহরণকারী নাট্যভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। ছেলের দলের বারবার একই ধরনের প্রশ্নের উত্থাপন এবং গায়ক শ্রেষ্ঠের সেই প্রশ্ন এড়িয়ে নিজ সাধনা ও তাতে সিদ্ধিলাভের নানা অবিশ্বাস্য কাহিনীর বর্ণনায় হাস্যরস জমে উঠেছে। এই কৌতুকরসের কাহিনী সুকুমার রায়ের কৌতুক রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ধ্বনির সহায়তায় তিনি বিচিত্র রঙের ছবি এঁকেছেন। কবির সুপরিচিত 'ঝর্ণা' কবিতায় রয়েছে অপরূপ ধ্বনি ঝংকার, সেই ধ্বনিঝংকার ঝর্ণার রূপকে স্পষ্টীকৃত করেছে, ঝর্ণার গতিতরঙ্গ ফুটিয়েছে,'ঝর্ণা, ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা'। চরকার গান, দূরের পাল্লা, পাল্কীর গান, ইলশে গুঁড়ি প্রভৃতি এই পর্যায়ের কবিতা।

কিশোরপ্রীতি বা কিশোরদের সঙ্গে একাত্ম হবার অভিপ্রায়ে এবং কিশোরদের আনন্দদানের উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু ধাঁধাও লিখেছেন। 'মৌচাক' পত্রিকার ১৩২৮ সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় তাঁর আটখানি ধাঁধা ছাপা হয়েছিল। একটির উদাহরণ,

নড়ন চড়ন নাইকো মোটে
ছোটে মাঠের পার।
আকাশ থেকে খবর আনে
অস্ত পাওয়া ভার।
উত্তর– চোখ।

শিশুসাহিত্যের ধারায় বাৎসল্য রসের কবিতা শিশুকে উদ্দেশ্য করে রচিত– শিশুর জন্য রচিত নয়। এ জাতীয় কবিতায় শিশুর শিক্ষণীয় বিষয় বিশেষ কিছুই থাকে না। সত্যেন্দ্রনাথের বাৎসল্য রসের কবিতায় পুরানের সমৃদ্ধি এবং বর্তমান দুর্দশার কারণ নির্ণয় ও দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের উপায় ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের দ্বন্দ্বচঞ্চল মানসিকতা দ্বারা পরবর্তীকালের কবিদের মতো তিনি আচ্ছন্ন হননি ঠিক কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে যে গভীর কাল ও সমাজ সচেতনতা ছিল তার প্রমাণ তাঁর 'সাম্যসাম', শুদ্র', 'মেথর', 'জাতির পাঁতি' এবং সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কিত বিবিধ কবিতাবলী। সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে কাব্য রচনার এই প্রবণতা নজরুলেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা করেছেন। রোমান্সের মোহে সত্যেন্দ্রনাথ কল্পনার আনন্দলোক থেকে রূপময় পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। মর্ত্যপ্রীতি সত্যেন্দ্রনাথকে করেছে রূপের কবি। রূপের এত বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব, এতটা প্রাধান্য তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন কবির মধ্যে ছিল বিরল। পৃথিবী ও প্রকৃতির রূপে গুণে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এই কারণেই তিনি পরিপূর্ণ ভাববিভোর ও রসের কবি হয়ে উঠতে পারেননি। সত্যেন দত্ত দেখার উপর জোর দিয়েছেন, অনুভূতির উপর নয়-কাজেই তাঁর অনেক কবিতা ছন্দোবদ্ধ রিপোর্ট-এর মতো হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে দেখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় যে বাংলাদেশকে আমরা পেয়েছি, তা রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো ধ্যানের গভীরে আমাদের আত্মস্থ করেনা বটে কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজবার জন্য বেরিয়ে পড়া বাবুই পাখীর মতো বাংলাদেশের পথে-ঘাটে আমাদের টেনে বের করে নিয়ে যায়। তাঁর কবিতা পড়ে বাংলার চারিদিকে আমরা নিজেদের ছড়িয়ে দেবার দুর্নিবার একটা প্রেরণা অনুভব করি। মুহূর্তকালের মধ্যে আমরা কাজলা দীঘির পারে গিয়ে দাঁড়াই, দেখি 'শোল্-পোনাদের তরুণ পিঠে কে যেন দেয় আলপনা!' ভোরের

রোদ হঠাৎ কমলা খোলার রোঁয়ার মতো হয়ে আমাদের মনটাকে প্রসন্ন করে তোলে।

সত্যেন্দ্রনাথ শিশুর মত কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে জগতের দিকে তাকিয়েছেন। যা দেখেছেন তাতেই মুগ্ধ হয়েছেন। অপূর্ব আনন্দে তিনি চরকার ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে কান পেতেছেন, পিয়ানোর টুংটাং শব্দ শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। শীতের ভোরে আনন্দে অধীর হয়ে তাতারসির গান গেয়েছেন। মাঝিদের দূরের পাল্লায় তাদের সঙ্গী হয়ে বাংলার পল্লীর বিচিত্র শ্রী ও সম্পদ দেখেছেন এবং আনন্দে তন্ময় হয়েছেন। সে আনন্দ কোন তত্ত্বোপলব্ধির আনন্দ নয়–রূপ প্রিয়ের সহজ সরল আনন্দ।

নাসীমুল বারী

# যুগ বিবর্তনে আজকের বাংলা সাহিত্য

**এক.**

মনের মানসিক চেতনার অনুভূতিশীল চাহিদার লেখ্য প্রকাশই সাহিত্য। সাহিত্য মন ও মানসিকতার স্বরূপ প্রকাশ করে। মানুষের অনুভূতিশীল মনের তৃষ্ণা মেটাতেই যুগে যুগে সাহিত্য রচিত হয়েছে। তাই সাহিত্য যুগের চাহিদার মানসিক চিত্রপট। এ জন্যেই যুগের সাথে সাথে সাহিত্যের ধারা প্রকৃতিরও রূপ পরিবর্তন ঘটেছে। ঘটেছে বিবর্তনও। সাহিত্যের এ পরিবর্তন-বিবর্তন মানবিক চাহিদায় প্রতিপন্ন হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞজনের অনুসিদ্ধান্তে সাহিত্যের কালধারা তিনটি অংশে বিভাজিত হয়েছে। ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আদিযুগ। ১২০১ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ। তারপর থেকে আজকের এ সময় পর্যন্ত আধুনিকযুগ। আধুনিকযুগের ব্যাপ্তি ক্ষুদ্র হলেও এ যুগে সাহিত্যের ধারা বিবর্তন ঘটেছে খুবই দ্রুত। এ যুগে সাহিত্য শাখা-প্রশাখায়, ধারা-উপধারায় বিভাজিত হয়েছে অনেক বেশি। গঠন প্রকৃতিতেও এসেছে নতুনত্ব–অভিনবত্ব। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ ছিল শুধু কিছু ধর্মীয় গীতিকবিতা বিশেষ। বৌদ্ধধর্মীয় কাব্যগীতি চর্যাপদ দোহাকোষই বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের একমাত্র সম্পদ। মধ্যযুগেও কাব্যই ছিল সাহিত্য। গদ্য সাহিত্যের উন্মেষ তখনো ঘটেনি। তবে সে সময়ে কাব্য ধারায় বিভিন্ন উপধারা-শাখা-প্রশাখা হয়েছে মাত্র। মুসলিম সাহিত্যিকগণ ধর্মীয় সাহিত্যের বাইরে নতুন একটি ধারা রোমান্টিক প্রণয় ধারার প্রবর্তন করেন। এটিও কাব্যধারা। মধ্যযুগে বিষয় বৈচিত্র্য ও ভিন্নতায় এসব কাব্য মূলত কাহিনী নির্ভর বড় কাব্যধারা। এর বাইরেও পদাবলীর একটি শুদ্ধতম ধারা 'বৈষ্ণব সাহিত্য' ধারারও বিকাশ ঘটে। রোমান্টিক প্রণয়ধারা ব্যতীত সকল কাব্যই ধর্মীয় ভাবাদর্শে একই গঠন প্রকৃতির ছিল।

মধ্যযুগ পেরিয়ে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগে প্রবেশ করে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। এ সময় থেকেই কাব্যধারায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। যুগসন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে ঈশ্বরগুপ্তকে ধরা হলেও কবিতার স্বরূপ গড়েন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি পাশ্চাত্যে কাব্যরীতি ও ভাবনাকে সংশ্লিষ্ট করেন প্রাচ্যরীতি আর ভাবনার সাথে। এভাবেই আধুনিকতার একটি ছাঁচ তৈরি করেন বাংলা কাব্য জগতে। সনেট তেমনি একটি আধুনিক ছাঁচ। তাঁর কলমেই সর্বার্থে আধুনিক কবিতার পথযাত্রা।

শুধু কবিতায় নয়, আধুনিক যুগে সাহিত্যের বিবর্তন ঘটে অসম্ভব দ্রুত আর চমকপ্রদ বিষয় আঙ্গিক বৈচিত্র্যে। বিষয় বৈচিত্র্যের সাথে সাথে গঠন প্রকৃতিতেও আসে ভিন্ন ধারা। ১৮০১ থেকে ২০০৮ সালের আজকের এ সময়-যুগের কালধারায় বেশি সময় নয়। কিন্তু সাহিত্যের বিবর্তন ধারায় এ সময়টা এত বিরাট যে আগের বাংলা সাহিত্যের দু'কালে যা ঘটেনি, এ ক্ষুদ্র সময়ে তার চেয়েও বেশি ঘটেছে। পুরোনো সব ধারা উপধারাকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয় আধুনিক এ সময়। উন্মেষ ঘটে নতুন পটভূমি-গদ্যসাহিত্যের। এ সময়ে গদ্য-পদ্য মিলে সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা-উপশাখার উদ্ভব সংখ্যা রীতিমতো চমকে যাওয়া ব্যাপার। সাহিত্যের নিত্য-নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে আজও। তাইতো আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নিত্য চমকের নব নব পথ রচনায় ব্যস্ত। আজ যা নবধারা, কালই তা পুরোনোর দলে ভিড়ছে। আজকের সব লেখকের মনোচেতনাই থাকে নতুন কিছু উপহার দেয়ার।

আধুনিক যুগের উৎকর্ষতার স্বীকৃতিও মিলে বিশ্ব দরবারে। বাংলা সাহিত্য বিশ্বজয় করে যুগের প্রথম দিকেই। রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয় আমাদেরকে আমাদের ভাষা-সাহিত্যকে গৌরবে মহিমান্বিত করার সাথে সাথে নজরুল, ফররুখ, বিভূতিভূষণ, শরৎ, মানিক, বঙ্কিম, মধুসূদন, শাহাদৎ, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আহমেদ-এমন বহু বহু সাহিত্যিকের কলমে বাংলা সাহিত্য আজ সুজলা সুফলায় সুজ্জিত করেছে।

**দুই,**

আধুনিক যুগের এ সময়ের সাহিত্যকে প্রধান দুটো ধারায় ভাগ করা যায়-পদ্যসাহিত্য, গদ্যসাহিত্য। পদ্যসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের আদি ধারা হলেও এ সময়ে এসে গঠন প্রকৃতি আর মনোজাগতিক বৈচিত্র্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ও অনুভূতির তৃষ্ণা সৃষ্টি করেছে। এ সময় রবীন্দ্রনাথ যেমন আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়ায় তার কাব্যধারা চালিত করেছেন, ঠিক সে সময়ে নজরুল বিদ্রোহীধারায় রক্ত প্রবাহকে উত্তেজিত করে তুলেছেন। মধুসূদন পৌরাণিক কাহিনীকে মানবিকতায় আধুনিকতার রূপ দিয়েছেন, ফররুখ মানবিক বিশ্বাসের চেতনাকে পুষ্পিত করেছেন। এভাবে বিষয় বৈচিত্র্য আর মানসিক চেতনায় বিরাট বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় আধুনিক সময়ের কবিতায়।

আধুনিক যুগে প্রবেশ করে কবিতা প্রথমেই বিবর্তন ঘটায় কাহিনী নির্ভর বড় কাব্যে। পদাবলী জাতীয় ছোট ছোট একক কবিতা রচনা করতে গিয়ে কবিগণ কবিতার গঠনগত, বিষয়গত বহু শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ঘটিয়েছেন। সে সব ধারা মুছে না দিয়ে ক্রমান্বয়ে গতিশীল হয়ে আজ পর্যন্ত চলমান আছে।

এখন এ সময়ে কবিতা রূপক, প্রতীকী, বিমূর্ত, মন্ময়, পরাবাস্তব, আধুনিক, উত্তর আধুনিক ইত্যাদি বিবিধ বিষয়গতভাবে যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি গঠনগত দিক থেকে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, অমিত্রাক্ষর, গদ্যকাব্য ইত্যাদি ধারায়

বিকশিত হচ্ছে। এসব কবিতার প্রতীকী বক্তব্যে বিমূর্ত অবস্থানই যেন আজ জাতি প্রিয় হয়ে দেখা দিচ্ছে। মধুসূদনের কলম থেকে কবিতা আধুনিকতার স্পর্শে জ্বলে উঠে রবীন্দ্র-নজরুল-ফররুখ-আল মাহমুদ-শামসুর রাহমান হয়ে আজকের তরুণ প্রজন্মের কবিদের কলমে বিকিরিত হচ্ছে। এখন কবিতা প্রতীকী বক্তব্যে ঠাসা চিত্রকল্পে অনেকটাই বিমূর্ত হয়ে ওঠে। শব্দের চমৎকার বুননে অভিনব ব্যবহারে কবিতাগুলো বেশ মুগ্ধ হয়ে উঠছে। কবিতার গঠন প্রকৃতি কতো আধুনিক রূপ লাবণ্যে কাব্যরসিককে প্রেম নিবেদন করছে। কবিতার এ প্রেম সাহিত্য পিয়াসীদের কৃষ্ণের বাঁশির মতোই উতলা করে তোলে।

কবিতার মতোই সাহিত্যের আরেকটি শক্তিশালী মাধ্যম ছড়া। অন্তমিল নির্ভর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা ছন্দ সুরে অপূর্ব ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে কাব্যধারার উন্মেষ ঘটায়, তা-ই ছড়া হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নেয়। ছোটদের কিংবা বড়দের সবার কাছেই ছড়ার আবেদন আকাশচুম্বি। ছড়া সাহিত্যের অস্তিত্ব মধ্যযুগে থাকলেও তা ছিল মুখে মুখে প্রচলিত নীতিকথা মূলক। কিন্তু আধুনিক এ সময়ে এসে তা হয়ে উঠছে হাতিয়ার সম। ছড়া ঘুম পাড়ানিরও, ঘুম তাড়ানিরও। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে ছড়ার বিকল্প খুঁজে পাওয়া দুস্কর। তাই 'তাড়াতে' 'মাড়াতে' আর 'ঘুম পাড়াতে' ছড়ার ব্যবহার বিকল্পহীন সাহিত্যধারায় পোক্ত।

এতো গেল এ সময়ের পদ্যসাহিত্যের কথা। কিন্তু গদ্যসাহিত্য?

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বিস্ময়কর উন্মেষ গদ্যসাহিত্য। কাব্যের ছন্দ-সুর যেখানে শেষ; গদ্যসাহিত্য তারও গভীরে প্রবেশ করতে পারে। জীবনের অণুপুঙ্খানু চিত্রপটের সজীব চিত্রায়নই গদ্য সাহিত্য। গদ্যসাহিত্যের উন্মেষ একটি ধারায় ঘটেনি, ঘটেছে বহু ধারায়। বড়গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা, প্রবন্ধ,নিবন্ধ ইত্যাদি বিবিধ শাখাতো আছেই, আবার বহু প্রশাখাও আছে।

গদ্যসাহিত্য জীবনের পরতে পরতে প্রবেশ করে জীবনের গভীরতাকে তুলে ধরে পাঠক মনে রসের যোগান দেয়। জীবনের বৈচত্র্যময় ক্ষণের ঘটনা, দুর্ঘটনা, আনন্দ-শিহরণ, রোমাঞ্চ, দুঃখকথাই গল্প। চলমান এ গল্প প্রতিক্ষণেই ঘটে যাচ্ছে দৃষ্টির সীমায়, শ্রুতির আঙ্গিনায়। দৃশ্যমান বা ইথারে ভাসমান এ সব গল্পকে কল্পনার রং-এ ভাষার তুলিতে নান্দনিক ঢং-এ উপস্থাপন করাই সাহিত্য। সাহিত্যের গাল্পিক এ ধারা প্রধানত তিনটি-ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক। সাহিত্যের এ ধারায় যিনি কাজ করেন তিনিই কথাশিল্পী। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, দৃশ্যপট কথাশিল্পীর সুনিপুণ কলমে গদ্যসাহিত্যেই তুলে আনা যায়। গদ্যসাহিত্যের এ অনন্য বৈশিষ্ট্যই তাকে সাহিত্যে উঁচু মর্যাদা দিয়েছে।

পাঠকের কথোপকথনের সাথে সাহিত্যের সরাসরি সম্মিলনে উন্মেষ ঘটে নতুন পটভূমি-গদ্যসাহিত্যের। মানুষের একান্তই মুখের ভাষাকে সাহিত্যে উপস্থাপনই গদ্যসাহিত্য। প্রথম দিকে গদ্যসাহিত্য কিন্তু একেবারেই মুখের ভাষা ছিল না। মুখের এ ভাষাকে পরিশুদ্ধ মাত্রায় পরিবেশন করা হতো। তাতে পাঠক লৌকিক ভাষা খুব একটা খুঁজে পেত না। এমনি ক্ষণে প্যারীচাঁদ মিত্র আর প্রমথ চৌধুরী একদম মানুষের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন। মূলত প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলাগদ্যে যে ভাষারীতির সূত্রপাত করেছিলেন 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থের মাধ্যমে, প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' সাময়িকীর মাধ্যমে সে ভাষারীতিকে আধুনিক চলিত রীতির দ্বারপ্রান্তে এনে উপস্থিত করেন।

গদ্যসাহিত্যের বহু ধারা থাকলেও প্রধানত এই তিনটি ধারাতেই জীবনের খন্ডচিত্র ধারণ করে। সমাজ সভ্যতায় চলমান মানবিতাকে প্রাণবন্ত আর সজীব দৃশ্যপটে চিত্রিত করার শিল্পীত স্বরূপই গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি। গদ্যসাহিত্য আজ পাঠক হৃদয় জয় করা সাহিত্য। আধুনিক যুগের একদম প্রথমেই উন্মেষিত এ গদ্যসাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালুর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়নিক শৃঙ্খলার পত্তন হয়। এ সময় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন বাইবেলের অনুবাদক মিশনপাদ্রী ও বাংলায় অভিজ্ঞ উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)। বাংলায় অভিজ্ঞ এসব ভিনভাষীদের হাত ধরেই বাংলা গদ্যের উন্মেষ, যদিও ষোড়শ শতকে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। সে সময়ের বাংলা গদ্য বলতে আসলে রাজা-রাজড়ার চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজকেই বুঝানো হয়। সাহিত্যের স্ব-মর্যাদায় বাংলা গদ্যের উন্মেষ কেরী সাহেবের হাত ধরেই। তিনি সুশৃঙ্খল গদ্যের পথিকৃৎ রূপে শিক্ষার উপযোগী করে ১৮০১ খৃষ্টাব্দেই 'কথোপকথন' নামে বই লিখে প্রেসে ছেপে প্রকাশ করেন। এ বই কলকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও আচার-ব্যবহার নিয়ে রচিত। তবে এটি বাংলা গদ্যের প্রথম বই নয়, দ্বিতীয় বই। বাংলা গদ্যের প্রথম বইটি রচিত হবার সাথে সাথেই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ পায়-আর সে ভাগ্যবানও ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়া লেখক হলেন রামরাম বসু। তিনি কেরী সাহেবের অনুপ্রেরণায় ১৮০১ খৃষ্টাব্দেই লিখে ফেলেন জীবনের কাছাকাছি বিষয় নিয়ে সুশৃঙ্খল আর সাহিত্যের মর্যাদায় চমৎকার গদ্যসাহিত্য 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত'। রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) ছিলেন ইউলিয়াম কেরীর সহযোগী। কেরীকে বাংলা শেখান তিনি। এভাবে গদ্যসাহিত্য এগিয়ে চলে আধুনিক যুগের প্রথম ক্ষণ থেকেই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৩ টি গদ্যসাহিত্য গন্থের অস্তিত্ব মেলে।

গদ্যসাহিত্যের প্রধানতম একটি শাখা উপন্যাস। এ ধারায় প্রথম গ্রন্থ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' হলেও সফল উপন্যাসশিল্পী হলেন বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কলমেই উপন্যাস স্বীয় রূপ-যৌবনে পাঠক সমাজে নিজের উপস্থিতিকে জানান দিতে পেরেছে। উপন্যাস মূলত বৃহত্তর পটভূমিতে চরিত্র-উপচরিত্রের সম্মিলনে জীবনের দ্বন্ধ-সংঘাত, আনন্দ-বেদনা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মানসচিত্র। উপন্যাস টেস্ট ক্রিকেটের মতো বড় ক্যানভাসে অনেক ঘটনা-চরিত্র চিত্রণে দীর্ঘ সময় পাঠককে আটকে রাখে সাহিত্যের বনেদী আড্ডায়। আর ছোট ছোট ঘটনার ঘনঘটায় সৃষ্ট অনুভূতিশীল মনের সাহিত্যকৃতি ছোটগল্প হিসেবে পরিচিত। ছোটগল্প সাহিত্যকে দিয়েছে নতুন অনুরণন। দিয়েছে পাঠক মনে তৃপ্তি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো অবয়ব ছোট গল্পের। তাই ছোটগল্পের গতি মনের অনুভূতিতে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে পাঠককে মুক্তি দেয়। একদিনের ক্রিকেটের মতো এর রেশ-সুখানুভূতি পাঠক ক্ষণে ক্ষণে উপভোগ করে। আসলে জীবনের একটি খন্ডাংশ বা ঘটনাকে ধারণ করে মনের অনুভূতিশীল শিহরণে চিরায়ত চিত্রণের অতৃপ্ত রসনাই ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যের সার্থক ও আদর্শ ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ছোটগল্পের তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় জন আর নেই। আজ বাংলা সাহিত্যের পরতে পরতে ছোটগল্পের প্রাধান্য বাংলা সাহিত্যকে অনুপম সৌন্দর্যের সৈকতে নিয়ে গেছে। গল্প-উপন্যাসের ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটের অভিনয় চিত্রণই নাটক। নাটক সাহিত্যেরই একটি জীবন্তধারা। নাটক সাহিত্যকে আরো জীবনের ঘনিষ্ঠতায় নিয়ে আসে। সমাজ সচেতনতায় নাটক এবং সার্বিকভাবে গদ্যসাহিত্য অসম্ভব কার্যকরী।

প্রথম দুইযুগে অনুপস্থিত গদ্যসাহিত্য আধুনিক যুগে এসে ঝড় বইয়ে দিয়েছে সাহিত্যাকাশে। বাংলা সাহিত্যে গদ্যসাহিত্যের উন্মেষ কাব্য জগতকে ম্রিয়মান করে ফেলছে। প্যারীচাঁদ, মধুসূদন, প্রমথ, রবীন্দ্র, বঙ্কিম, বিভূতিভুষণ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, মীর মোশাররফ, ডা. লুৎফর রহমান প্রমুখ থেকে শুরু করে আজকের এ সময় পর্যন্ত অনেক অনেক লেখকই তাদের লেখনীসৃষ্টিতে মানব ও সমাজ জীবনের ছায়াপাত অংকন করে গদ্যসাহিত্যের যে উৎকর্ষতা এনেছেন-সে ঋণ অপরিশোধ্য। আজ এ বাংলাদেশেই অসংখ্য, অগণিত গদ্য লেখকের উপস্থিতি রয়েছে। পাঠক মন জয় করায় গদ্য লেখকের মনের প্রশান্তিও বেড়েছে অনেক। গদ্যসাহিত্য তাই মজবুত অবকাঠামোতে ইমারত নির্মাণ করে চলছে।

**তিন.**

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতীক, রূপক, উপমার ব্যবহার বেশ লক্ষ্যণীয়। কাব্যের আধুনিকতার পথিকৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রিয় কপোতাক্ষ নদের স্রোতকে 'মাতৃদুগ্ধের স্রোত' প্রতীকে অনুভব করেছেন। এমন অনুভব কবির কল্পনায় সাহিত্যের আঙ্গিনায় সম্ভব হয়েছে। সাধারণ ভাষা বা ভাব বিনিময়ে নদীর স্রোতকে 'মায়ের দুধ' বলা পাগলের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবা হবে না। সকালের শিশির বেশ মোহনীয়। কিন্তু এর রেশ সূর্যের প্রখরতার সাথে সাথেই মিলিয়ে যায়। সতের/আঠার বছর বয়সের নববধূ সংসারে শিশিরের মতো এমন মোহনীয় বটে।

সংসারে আসার পরপরই যদি সাংসারিক জ্বালাতনী প্রখরতায় সে বধূর মৃত্যু হয় তবে তা 'শিশির' তুল্যই। আর এমন চমৎকার প্রতীক একেঁছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্প 'হৈমন্তী'তে। নজরুল 'ভগবানের বুকে পদচিহ্ন' একেঁ দেবার ঘোষণা দিয়েছেন। ভগবান-অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার বুকে পা রাখা মানেই ভগবানের চেয়ে বড় হওয়া। আসলে কি তাই? না, এখানেও নজরুল প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে তিনি 'ভগবান' প্রতীকে শোষক ইংরেজ রাজের বুকে লাথি মারার সাহস দেখিয়েছেন সাহিত্যে প্রতীকের অপূর্ব ব্যবহার করে।

আসলে প্রতীক কখন কিভাবে কে ব্যবহার করবে-তা কবির মনের দুয়ারে আঁটা তালিকাই বলতে পারে। কবি লিখতে লিখতে যখন যে অর্থে যে প্রতীককে কল্পনায় আনেন, তাই ব্যবহার করেন। এ জন্যে প্রতীকের কোন আভিধানিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন পড়ে না, নেইও। একজন লেখকের চেতনায় বিশ্বাসের যে ভিত থাকে-তাকে কেন্দ্র করেই লেখক লেখে থাকেন। এ লেখাতে যে প্রতীক ব্যবহৃত হয়-তাও তার চৈতন্যের সাথে সম্পূরক। জীবনানন্দ দাশ পুনর্জন্মাবাদে বিশ্বাসী ধর্মমতের একজন। আর তাই শঙ্খচিল, লক্ষীপেঁচা, শালিক ইত্যাদি স্বরূপে বারবার ফিরে আসার প্রত্যাশা সেই পুনর্জন্মাবাদ বিশ্বাসেরই প্রতীক। নজরুলের চেতনায় চঞ্চলতা বিদ্রোহ মিশে আছে। আর তাই তিনি ইংরেজ শাসকদের 'ভগবান' প্রতীকে বুকে পা রাখতে চেয়েছেন। 'সাত সাগরের মাঝি'-সাধারণ অর্থে বিশ্বের সব সাগর চষে বেড়ানো এক নৌ চালককে বুঝানো হয়। কিন্তু ফররুখ আহমদের শৈল্পিক চেতনায় তা নয়। শত ঝড়-ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে যিনি সঠিক দাঁড় ধরে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছতে সাহস ও শক্তি রাখে, হিম্মত হারায় না, সাত সাগর চষে বেড়ানো সেই নাবিক অবশ্যই দুঃসাহসী। অকুতোভয় বীর। আজকের ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে নিজেদের স্বাধিকার আর আত্ম-প্রতিষ্ঠার গন্তব্যে পৌঁছুতে চাই এমন দৃঢ় শৌকর্যের নেতৃত্ব। ইংরেজ শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারার মতো দুর্জয়, দুঃসাহসী সেই নেতৃত্বই প্রতীকী অর্থে 'সাত সাগরের মাঝি'। চমৎকার প্রতীকে ফররুখ তাঁর কাব্য বিকাশ ঘটিয়েছেন। আধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ এ দুনিয়ার জীবন থেকে স্থায়ী ছুটি অর্থাৎ 'মৃত্যু'কে ছুটি প্রতীকে রূপায়িত করেছেন তাঁর অন্যতম সেরা ছোটগল্প 'ছুটি'তে। এখানে নায়ক ফটিক জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণে মায়ের কাছে ছুটি চেয়ে মৃত্যুর দিকেই চলে যায়। কী চমৎকার রূপকের ব্যবহার! এ সময়ের কবি আল মাহমুদ। দেশের স্বাধীনতার জন্যে অস্ত্রহাতের লড়াকু একজন প্রত্যক্ষ যোদ্ধা তিনি। তার চেতনায় প্রতীক হয়ে এসেছে বাংলা বিজয়ী দুর্জয় সৈনিক 'বখতিয়ার'। জনপ্রিয় প্রতীকী গদ্যসাহিত্যের অন্যতম একটি সার্থক উদাহরণ সত্যজিত রায়ের 'হীরক রাজার দেশে'। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জনতার বিজয়ের চমৎকার প্রতীকী উপস্থাপনা। যদিও এটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে এসেছে তবু বাংলা সাহিত্যেরই অংশ এটি। এভাবে এখন সাহিত্যে প্রচুর প্রতীক তথা রূপক, উপমা, বিমূর্ত চিত্রকল্পের ব্যবহার হচ্ছে। তাই বলা যায় আজকের এ যুগে সাহিত্যে

প্রতীকের বিবর্তন আমাদের সাহিত্যকে আধুনিকতার লেসাররশ্মির মনোমুগ্ধতা দিয়েছে।

**চার.**

আদি সমাজ থেকে সভ্যতায় উত্তরণের জন্য মননশীলতায় যে সকল উপাদান কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাহিত্য। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষণই সাহিত্য। সাহিত্য সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। হাজার বছরের পুরোনো বাংলা সাহিত্যের আজকের এ সময়ে গদ্য-পদ্য উভয় সাহিত্যই জীবন ও পারিপার্শ্বিক সমাজ চিত্র, রাজনৈতিক চিত্র, আদর্শিক বিধি ভিত্তির উপর ভর করে বেড়ে উঠছে অনবরত। গঠন প্রকৃতিতেও যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন যোজন। শব্দ চয়নে, বাক্যের গঠনে চমৎকার উপস্থাপনায় সজ্জিত আজকের সাহিত্য যৌবনের দ্বারে দাঁড়িয়ে। প্রতীক-বিমূর্ত চিত্রকল্পে মনের অনুভূতিতে বিশেষ অনুসজ্জায় রূপায়িত হয়েও সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে। আর এজন্যই মানব জীবনে বিনোদন আর মনের তৃপ্তির প্রধান একটা অংশই সাহিত্য ও সাহিত্য নির্ভর কর্মকান্ড। সময় আর মানুষের মন চেতনার ক্রম পরিবর্তনের মাঝেই সভ্যতা যেমন এগিয়ে চলেছে, তেমনি সাহিত্যও তার বিষয় গঠন আর রূপ অলঙ্করণে উন্নতির নতুন নতুন ধাপে উঠে আসছে। আধুনিক, উত্তর আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বদরবারে মাথা শুধু উঁচুই করেনি নিজের আসনও পোক্ত করেছে। বাংলা সাহিত্যের এ গৌরব লেখকদের বদৌলতে। লেখকরা লিখছেন-সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে। আগামীতে আরো ঋদ্ধ লেখক বাংলা সাহিত্যকে নন্দিত সাজে গৌরবান্বিত করবেন–এমন প্রত্যাশা অন্যায় নয়।

কুইন রহমান

# সিরাজগঞ্জের লোকনাট্য

অনেক ইতিহাস আর ঐতিহ্য লালিত বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ শহর। যমুনা বিধৌত এই সিরাজগঞ্জ শহর লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যে ভরপুর। শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও আপন মহিমায় নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাঝে আজো উজ্জ্বল হয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রে টিকে আছে সিরাজগঞ্জের লোকনাট্য। সিরাজগঞ্জের লোকনাট্য প্রসঙ্গে আলোকপাত করার পূর্বে পাঠকদেরকে নাটক এবং লোকনাটক সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জনৈক ইংরেজ লেখক বলেছেন "অ ফৎধসধ রং ধহ ধৎঃরপঁষধঃবফ ংঃড়ুু ঢ়ৎবংবহঃবফ রহ ধহ ধপঃরড়হ." আর সংস্কৃত আলংকারিকগণ নাট্য সাহিত্যকে কাব্য সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। তাদের মতে কাব্য দুই প্রকার – দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য। রঙ্গ মঞ্চের সাহায্য ব্যতীত নাটকীয় বিষয় পরিস্ফুট হয় না। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যে, প্রথমত পূর্ববঙ্গ, দ্বিতীয়ত সভাপূজা, তৃতীয়ত নাটকীয় বিষয় এবং তারপর প্রস্তাবনা। প্রস্ত াবনার পর ১ম অংক শুরু হয়। নাটকের চষড়ঃ বা বিষয়বস্তু প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত হতে পারে। নায়ক রূপবান, গুণবান, সুশীল হবে। নাটকে পাঁচটি অংক থাকতে পারে। নাটক দৃশ্যকাব্য বলে এটি অভিনয় করে সামাজিকগণকে দেখানো হয়। এই অভিনয় সাধারণত চার প্রকারের হয় – আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।

প্রাচীনপন্থীরা নাটকে তিনটি ঐক্যনীতি মেনে চলতেন, যথা (১) সময়ের ঐক্য (২) স্থানের ঐক্য ও (৩) ঘটনার ঐক্য। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হতে হবে।

কোন নাটক পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে নাট্যকার, অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ ও সামাজিক এই কয়েকটি বিষয় সম্মন্ধে অবহিত হতে হবে। নাট্যকার বিষয়বস্তুকে প্রাণ দেয়। রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতা ও প্রযোজক তাকে রূপদেয় এবং সামাজিক তাকে প্রত্যক্ষতা দেয়। নাটক রচনাকালে নাট্যকার আখ্যান ভাগ (ঢ়ষড়ঃ), নাটকীয় ঘটনা (অপঃরড়হ), চরিত্র (ঈযধৎধপঃবৎব্লধঃরড়হ), কুশীলব (উৎধসধঃরং চবৎংড়হধব), সংলাপ (উরধষড়মঁব), স্থানীয় পরিবেশ (খড়পধষ ঈড়ষড়ঁৎ) ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হবে। প্রত্যেক নাটকই সাধারণত পাঁচটি অংকে বিভক্ত হতে পারে। যেমন-

(১) প্রারম্ভ (ঊীঢ়ড়ংরঃরড়হ) (২) প্রবাহ (এৎড়ঃিয) (৩) উৎকর্ষ (ঈষরসধী) (৪) গ্রন্থিমোচন (উবহড়ঁবসবহঃ) (৫) উপসংহার (ঈধঃধংঃৎড়ঢ়যব)

প্রথম অংকে আখ্যানভাগের সূচনা, দ্বিতীয় অংকে জটিলতা সৃষ্টি, তৃতীয় অংকে চরম উৎকর্ষ, চতুর্থ অংকে জটিলতা মুক্তি এবং পঞ্চম অংকে উপসংহার।

নৃৎ ধাতু থেকে নাটক কথাটির উৎপত্তি আর নৃত্য থেকে ভারতীয় নাটকের জন্ম। আমাদের লোকনাট্যের অনেকখানি জায়গা দখল করে রেখেছে নৃত্যের মত আদিকলা। প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম সাধনা চলে আসছে। আমাদের লোক নাটকের যে ধারাটি আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে প্রবাহমান সেখানেও আমরা ধর্ম এবং কলার সহ-অবস্থান দেখতে পাই। কেননা আমাদের লোক নাটকের মূল্যও এই প্রাচীন ধর্মের মাঝেই নিহিত। এই নাটক যেখানে যেভাবেই অভিনীত হোক না কেন ধর্মের প্রকাশ নানাভাবে সেখানে উপস্থিত থাকে। যাত্রা, পালা, পাঁচালী, কথকতা ইত্যাদি লোকনাট্যের অন্তর্ভূক্ত।

লোকনাট্য বলতে আমরা প্রথমত এবং প্রধানত সেই কলাকেই বুঝি যা আদিকাল থেকেই নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে চলে আসছে। যা কিনা আমাদের ঐতিহ্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। লৌকিক বিশ্বাস, ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক আচার-আচরণ, জীবনের দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্য নিয়েই লোক নাটকের জন্ম। নিজস্ব আঞ্চলিক পরিবেশে বিকাশ লাভ করলেও নাট্যের বৈভব আর সংবেদনশীল গুণরাজী নিয়ে মানচিত্রের সীমা লংঘন করেছে। দেশ, কাল, পাত্রের গন্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি।

লোকনাট্য পরিবেশনার উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে উন্মুক্ত প্রাংগন। বাড়ীর উঠান, খোলা মাঠ, হাট খোলা, নদীর পাড়, স্কুল প্রাংগন, বটতলা, পূজামন্ডপ ইত্যাদি। যেখানে ৮ হাত × ১২ হাত জায়গাকে বাঁশ দিয়ে ঘেরা দেয়া হয়। কখনও মাটি ফেলে সামান্য উচুঁ করা হয়। কখনও রংঙ্গীন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়। হ্যাজাক বাতি জ্বালানো হয়। আর এটাই হলো লোকনাট্যের আদর্শ মঞ্চ। মঞ্চে পাত্র-পাত্রী ঢোকার সামান্য সরু খানিকটা রাস্তা থাকে। মঞ্চের দু'পার্শ্বে বসে যন্ত্রী ও প্রমোটর। দর্শকদের বসবার জন্য খড় বা চট বিছিয়ে দেয়া হয়। ধনী-গরীব সবাইকে একই আসনে বসতে হয়।

সিরাজগঞ্জের লোকনাট্য বাংলাদেশের লোকসমাজে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যমুনা তীরবর্তী প্রকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এ জেলার মানুষের বিনোদনের একটি অন্যতম মাধ্যম লোকনাট্য। মাঝী পাড়া, ধোপা পাড়া, কুমার পাড়া-লোকনাট্য পরিবেশনার জন্য পরিচিত এলাকা হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে দীর্ঘ দিন থেকে। এর প্রধানতম কারণ হলো লোকনাটকের কাহিনী ও এর পাত্র-পাত্রী। কাহিনীর গতি প্রকৃতির যে আসল উপাদান তাতো এইসব খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। শিবঠাকুর তাই এদের কাছে হয়ে ওঠেন মহান পুরুষ। গাজনের পালা সেই বৈদিক যুগ থেকেই বাঙ্গালীর ঘরে তাই এত সমাদৃত।

চৈত্রমাস এলেই বেঁজে উঠে ঢাক। তৈরী হয় গাজনের দল। সাজানো হয় শিব, পার্বতী ও কালী। সংগে থাকে কিছু জীবজন্তু। পাড়ার সুঠাম দেহের একজন জটাধারীকে শিবঠাকুর বানানো হয়। তার হাতে থাকে ত্রিশুল। দুই তরুণ কে সাজানো হয় পার্বতী আর কালী। মুখোশ পরিয়ে বানানো হয় জীব-জন্তু। এরপর শোভা যাত্রাসহ দল বেঁধে বেরিয়ে পরে গ্রামের পথে। প্রায় প্রতিটি বাড়ীর উঠোনে এরা নেচে গেয়ে অভিনয় করে মাতিয়ে তোলে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপভোগ করে গাজনের এই পালা। এদেরকে কোন বনেদী বাড়ীর উঠোনে দেখা গেছে বলে শোনা যায়নি। পন্ডিতেরা মনে করেন শিবঠাকুরের আগমন ভারতীয় অনার্য সমাজ থেকে। লোকনাটকেও তার অনার্য গ্রাম্যরূপ পরিলক্ষিত হয়।

সিরাজগঞ্জ শহর সংলগ্ন একডালা গ্রাম। ঘুড়কা গ্রামের বনসন্যাসী তার পুত্র কংস এই গাজনের পালার এক সময়ের প্রধান পুরুষ ছিলেন বলে জানা যায়। গোপালের গোষ্ঠ যাত্রা নিয়ে আরো একটি গ্রাম্যপালা বাংগালী সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। গোষ্ঠ যাত্রা উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের কালিয়া, পরিপুর এবং ঝাঐল গ্রামে এক সময় জমজমাট মেলা বসতো। যাকে গোষ্ঠের মেলা বলে সবাই জানতো। সেখানে হাজরা ছেড়ে দেয়া হতো। সেখানে শিমুল গাছের মাথা কেটে চড়ক লাগানো হতো। চড়কে বড়শী গেঁথে একজন যুবককে জিহ্বার মধ্যে লোহার শলাকা ফুটিয়ে ঘুড়ানো হতো। এখনও সেই স্মৃতি নিয়ে মেলা টিকে আছে। তবে যমযমাট অবস্থা নেই।

আজকের যাত্রাপালা লোকনাট্যের ঐতিহ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে। লোকপ্রিয় পালাগুলোর মধ্যে চন্ডীযাত্রা, শিবযাত্রা, মনসার পালা, ভাসানযাত্রা, রামযাত্রা, কমলা সুন্দরীর পালা, পুষ্পমালার পালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত ঘুড়কা গ্রামের নরহরি ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে পরিবেশিত ভাসানযাত্রা এক সময়ে সিরাজগঞ্জ জেলার বাইরেও খুব সুমান অর্জন করেছিল। লোকনাটকের এই ধারার সাথে জড়িত আরো যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন রায়গঞ্জের জয়রাম, মধুশীল, খলতা গ্রামের বংকু বিহারী, শিবেন, ছাতিয়ানতলীর রমণীমোহন সূত্রধর। তার পুত্র রতনলাল সূত্রধর সিরাজগঞ্জের একজন প্রতিষ্ঠিত সংগীত শিক্ষক। মেছরা গ্রামে দুটি পাড়া ছিল-ঘোষপাড়া আর জেলেপাড়া। বারোমাসে তেরো পার্বন লেগেই থাকতো সেখানে। আর সেখানে চলতো লোকনাট্যের উৎসব। মেছরা স্কুলের মকবুল মাষ্টার ছিলেন অভিনয় পাগল মানুষ। নিজেদের চেষ্টায় মকবুল মাষ্টার নাট্যমঞ্চ তৈরী করেছিলেন মেছড়া হাটে।

সং পালা নামে আরো একটি লোকনাট্যের কথা শোনা যায়। সমাজের বিভিন্ন অসংগতি তুলে ধরে এই সং পালা হতো। চর রায়পুর গ্রামের সন্তোষ ও হরিভোলার সং এর কথা আজো মানুষ মনে রেখেছে।

বিষাদসিন্ধুর মর্মস্পর্শী কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠা প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই লোক নাটকটির রচনা ও পরিবেশনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন ঘুরকা গ্রামের রহিম

বক্স সরকার। তাঁকে যারা সহযোগিতা করেছেন এবং তাদের মধ্যে একই গ্রামের মেহের বকস সরকার ও গোলাম হোসেন উল্লেখযোগ্য। খুদ পিপাসায় কাতর শিশু জয়নালের করুণ আর্তি সকলের অন্তরকেই এক অনির্বাচনীয় করুণ রসে আর্দ্র করেছে। এলাকার গণমানুষের মনে এই নাটকটি এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে বছরে প্রায় সকল সময় এর মঞ্চায়ন অব্যাহত ছিল।

লোকনাটকের যেসব পালা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো তার প্রায় সবগুলোই বাংলার বিভিন্ন এলাকায় পরিবেশিত হয়ে আসছে। এছাড়া গুণাই বিবি, আলোমতি, প্রেমকুমার, রূপবান এসব পালাও লোকনাটকের অন্তর্ভূক্ত। যা সিরাজগঞ্জের উৎসাহিত মানুষদের দ্বারা বার বার অভিনীত হয়ে আসছে।

বর্তমানে মুক্ত নাটক ও পথ নাটক লোকনাট্যের অনুরূপ। এসব নাটকের পরিবেশনা লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজানো। অনির্দিষ্ট মুক্তমঞ্চ। দর্শক হিসাবে উপস্থিত সাধারণ মানুষ।

সিরাজগঞ্জের স্থানীয় সংগঠনগুলো পদ্ধতিগত নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি মুক্তনাটক ও পথনাটক মঞ্চায়নেরও চর্চা করে আসছে। এদের মধ্যে নাবিক নাট্যগোষ্ঠি, তরুণ সম্প্রদায়, নাট্যলোক, দুর্বার, রূপক, জহির রায়হান থিয়েটার, কথক, প্রসুন নাট্যচক্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের যিনি পথ নাটকের অন্যতম নির্মাতা-সেই মান্নান হীরা কিন্তু সিরাজগঞ্জের মানুষ। সিরাজগঞ্জের যমুনার পলি মাটির উর্বরতা তাকে নাটক সৃষ্টিতে শক্তিশালী ভিত সৃষ্টি করে দিয়েছে।

শত বছরের বিদ্রোহ আর সংগ্রামের ফসল লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আর নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের আজকের এই স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ ফসল আমাদের নাটক। স্বাধীনতার পরপরই ঢাকাসহ সারা দেশে নতুনভাবে নাট্য চর্চা শুরু হয়। তৎকালীন মহুকুমা শহর সিরাজগঞ্জের নাট্যকর্মীরা সারাদেশে পরিচিত হয়ে উঠে এবং সিরাজগঞ্জের জন্য বয়ে আনে দুর্লভ সম্মান। নাট্যচর্চায় তারা যোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

গল্প

আবদুল হাই শিকদার

# টুকরো টুকরো ক্রিকেট

**ক.**

রিয়াদ সাহেব অফিসে বসেছিলেন মুখ ভার করে। এই সময় ফোন বাজলো। তিনি রিসিভার তুলে তার স্ত্রী মীরার গলা শুনতে পেলেন।

"ওগো শুনছো ৩১৪। যা মজা লাগছে।"

রিয়াদ সাহেব নড়েচড়ে বসলেন, "কিন্তু তুমি যে সকালে চিরকুটে লিখে জানিয়েছো ৩৫০০ টাকার কথা।"

"৩৫০০ টাকা! "আরে দূর দূর। ছেলেমেয়েরা এখনও ড্রইংরুমে ৩১৪ রান, ৩১৪ রান বলে হৈ হল্লা করছে।"

রিয়াদ সাহেব কিছুটা হতচকিত হয়ে বললেন, "তুমি কি আজকের ক্রিকেট খেলার কথা বলছো?"

ওপার থেকে বিরক্ত কণ্ঠে মীরা বললেন, "তুমি আমার সাথে কথা বলার সময় অমন হাবা সাজার চেষ্টা কর কেন সব সময়, বলবে?"

ঠাস করে টেলিফোন রাখার শব্দ শুনলেন তিনি। রিয়াদ সাহেব চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগলেন।

**খ.**

ফোন বাজলো, "আব্বু আমি লিসা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বল, তোরা কেমন আছিস।"

"আব্বু খবর শুনেছো।"

"কোন খবর?"

"তুমি না আব্বু একদম বুড়ো হয়ে গেছো।"

"ঠিক আছে তুই বল।"

"তোমার অফিস থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে খেলা হচ্ছে আর তুমি বলছো কোন খবর।"

"ও আচ্ছা, বল।"

"৩১৪, এবং আমরা যা খুশি-শোন আব্বু, আমরা এক্ষুণি ঢাকায় রওয়ানা হচ্ছি। বাসায় একসাথে ইফতার করবো।"

"আমরা মানে হামিদও কি আসছে?"

"আসছে মানে, ওতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে।"

"বলিস কি!"

"ঢাকার মাঠে ৩১৪ রান, বল আব্বু ভাবা যায়! ইস কেন যে এ সময় চৌদ্ধগ্রাম এলাম। শোন আব্বু, তুমি কিন্তু আজ অন্য কোন কাজ রেখো না। ইফতারের পর অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে সবাই গল্প করবো।"

**গ.**

জেনারেল ম্যানেজার শাহাদত আখন্দ টেবিলে কয়েকটা ফাইল রেখে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

রিয়াদ সাহেব বললেন, "কি ব্যাপার হাসছেন যে।"

"স্যার আপনি ছাড়া পুরো অফিসের সবাই কানে রেডিও লাগিয়ে বসে আছে।"

"রেডিও কানে লাগিয়ে বসে আছে কেন?

"দুর্দান্ত খেলা স্যার। ঢাকার মাঠে এ রকম আর কখনও হয়নি। পাকিস্তান ৩১৪ রান করেছে।"

রিয়াদ সাহেব বললেন, "তা আপনি কি খেলা শুনছেন, না-কি?"

"মাঝে মাঝে চার আর ছক্কার মারগুলো শুনে নেই আর কি।"

**ঘ.**

ফোন বাজলো আবার, রিয়াদ সাহেবের মা ফোন করেছেন।

"কি ব্যাপার মা, তুমি হঠাৎ।"

"তুই তো সারাদিন আছিস অফিস অফিস আর অফিস নিয়ে। ছেলেমেয়েদের খোঁজ-খবর রাখার তো সময়ই পাস না।"

"কেন, কি হলো।"

"কি হলো মানে! বুলা বড় হয়েছে। ওর ঘরে এক ছোকরার ছবি টানিয়েছে।"

"কার ছবি টানিয়েছে?"

"তুই তো চিরকালের গাধা। ছবি কার টানিয়েছে তাও জানিস না।"

"ঠিক আছে তুমিই বল না।

বলবো আবার কি? ওই ছোকরা নাকি খালি চার আর ছক্কা মারে। আফরিদি না কাফরিদি কি যেন নাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পাকিস্তান দলের ক্রিকেট খেলোয়ার।

হ্যারে, ওই ছোকরা না কি এখন ঢাকায়, তা একটু খবর টবর নে না।

রিয়াদ সাহেব হাসলেন, কি যে বল মা।

পারিস তো শুধু সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিতে। কিন্তু মেয়ে যে ওই ছোকরাকে মন দিয়ে বসে আছে।

রিয়াদ সাহেব বললেন, ঠিক আছে আমি দেখছি।

টেলিফোন রেখে পায়চারী করা শুরু করলেন।

**ঙ.**

আবার ফোন বাজলো। লুৎফুল ফোন করেছে।

হ্যাঁরে, ইফতারের পর কি করবি।

কি করবো জানি না। মনে হয় বাসায় থাকবো।

ঢাকা ক্লাবে চলে আয়। বিজলানী আসবে।

কোন বিজলানী!

আরে আজহার উদ্দিনের দুই নম্বর বউ।

আজহার উদ্দিন- ও আচ্ছা আচ্ছা, দেখি।

ভয়াবহ খেলা হচ্ছে। সাঈদ আনোয়ার- এজাজ সেঞ্চুরি করেছে। এখন মনে হচ্ছে টেন্ডুলকার আর কলিকাতার ছোকরাটাও কিছু একটা করবে।

**চ.**

রিয়াদ সাহেবের কপালের চামড়া কুঁচকে গেল। গোটা দেশই কি আজ ক্রিকেট খেলা নিয়ে পড়ে আছে না-কি। তিনি এগারো তলার উপর থেকে ঢাকার দিকে তাকালেন।

**ছ.**

ইফতার টেবিলে টান টান উত্তেজনা। মা, মনি, যাদু, যাদুর কয়েকজন বন্ধু, রিয়াদ সাহেব ও রিয়াদ সাহেবের স্ত্রী মীরা। বুলাকে কিছুতেই তার ঘর থেকে বের করা গেলো না। অপূর্ব, অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয়, ঐতিহাসিক, বিশ্ব রেকর্ড, সাঈদ, সাকলায়েন, রবিন সিং, আজহার, ডালমিয়া, গ্যারি সোবার্স, গ্রেক চ্যাপেল, রবি শাস্ত্রী, আসিফ ইকবাল, গার্ডন গ্রীনিজ-কারুরই তর্ক থেকে বাদ পড়ার কোন কারণ নেই।

যাদু ড্রইংরুম থেকে টেলিভিশন সেট ট্রলিতে ঠেলে ডাইনিং স্পেসে নিয়ে এলো।

মাগরিবের আজানের দু'মিনিট আগে লিসা এসে হাজির। সারা গায়ে কাদাপানি। পিছনে কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা হামিদ। এসেই হাপুস-হুপুস কান্না। রেডিওতে খেলা শুনতে শুনতে গাড়ি চালাচ্ছিলো হামিদ। গতিবেগ বাড়ছে আর বাড়ছে। মিজমিজি গ্রামের কাছে একটা গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িসহ পড়েছে খাদে। স্থানীয় লোকেরা তাদের কাদাপানি থেকে টেনেটুনে বের করেছে। হামিদের কপাল একটু ছড়ে গেছে। বড় ধরনের কোন ইনজুরি হয়নি। শনির আখড়া থেকে ফার্স্ট এইড নিয়ে বেবী ট্যাক্সিতে এসেছে বাসায়। গাড়ি আছে পুলিশ হেফাজতে।

মীরাকে জড়িয়ে ধরে লিসা বললো, "জান মা, ৩১৪ রানের কথা শুনে ওর মাথা ঠিক ছিল না। বিজয়ের আনন্দ নিয়ে ইফতারের পর খাবো বলে কুমিল্লা থেকে তোমাদের জন্য কতো শখ করে ছানামুখী আর রসমালাই নিয়ে এসেছিলাম। সব মিজমিজিতে পানিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বলেই আরও একবার হাপুস-হুপুস করে কাঁদলো।

**জ.**

ড্রইংরুম থেকে রিয়াদ সাহেব একটা সম্মিলিত চিৎকার শুনলেন। মুঙ্গিয়া মুঙ্গিয়া-মুং গি য়া। নো চার, নো চার। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে কিচেন থেকে কাজের মেয়েটার প্রাণফাটা মরণ চিৎকার, "আল্লাহ্ গো আল্লা গো .....।" রিয়াদ সাহেব তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে কম্বল পেঁচিয়ে হুড়মুড় করে পড়লেন মেঝেতে।

**ঝ.**

কাজের মেয়েটি ডাল নামাচ্ছিল চুলা থেকে। ড্রইংরুমের সম্মিলিত চিৎকারে সে আৎকে ওঠে। সেই ফাঁকে গরম ডাল পুরোটা পড়েছে তার পায়ে। যাদু আর মনি তাকে নিয়ে তক্ষুণি ছুটলো হাসপাতালে। রিয়াদ সাহেবকে বিছানায় জোর করে শুইয়ে দেয়া হলো। ডাক্তারকে ফোন করে দিলো লিসা।

"রিয়াদ সহেব বললেন, তোমরা এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তেমন কিছু হয়নি আমার।"

রিয়াদ সাহেবের ঠোঁট কেটে গেছে। আর পা-টা একটু মচকেছে।

ডাক্তার বললো, "তেমন কিছু হয়নি। শুয়ে থাকুন। কাল দু'একটা পরীক্ষা করাবো।"

**ঞ.**

রিয়াদ সাহেব শুয়ে রইলেন। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়।

মা এসে কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, "খোকা, শোন। ছক্কা মারা ছোকরাটার সঙ্গে বুলার বিয়ের প্রসঙ্গটা বাদ দে। বুলা বোধ হয় মত পাল্টেছে। বাঁচা গেল। কি বলিস।"

রাতে পাশে শুতে শুতে স্ত্রী বললেন, "কি অলক্ষুণে খেলা গো।"

রিটা আশরাফ

# মিলেনিয়াম-২০০০

মাইজপাড়ার ঠিক মাঝখানে করিম মিয়ার একচালা ছনের ঘর। ঘরের ভেতরে বাহিরে দারিদ্যের নগ্ন দেয়াল। বয়সের ভারে করিম মিয়ার ছয় ফিট উচ্চতার শরীর কুঁজো হতে হতে সাড়ে চার ফিটে এসে থেমেছে। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দারিদ্রের ভারে শরীর হাড্ডিসার। বউ মারা গেছে দুই যুগেরও বেশি সময় আগে। ছয় সন্তানের পাঁচজনই পরপারে। একমাত্র জীবিত ছেলের নুন আনতে পানতা ফুরায় সংসার। সেখানে উগড়ে দেয়া বমির মতোই করিম মিয়ার অবস্থান। চোখের ঝাপসা চাউনি নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে এখনো টুকটুক করে গ্রামময় হেঁটে বেড়ায় করিম মিয়া। আর কালের নীরব সাক্ষী হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে চারপাশ। যদিও বাকশক্তি এবং শ্রবণশক্তি এখনো পুরোপুরি রুদ্ধ হয়নি করিম মিয়ার।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলও শেষ হওয়ার পথে। ঘরের দাওয়ায় তার আগে থেকেও শকুনের মতো ঘাড় কুঁজো করে বসে আছে করিম মিয়া। ভাত খাওয়ার ডাক পড়েনি এখনো। ক্ষুধা চাগিয়ে চাগিয়ে উঠে তার পেটের ভেতর। অবশেষে লাঠিতে ভর করে হাঁটতে হাঁটতে মিয়াদের পুকুর পাড়ে এসে বসে করিম মিয়া। লাঠিটা খুব যত্ন করে রাখে একপাশে। পৃথিবীতে এখন এই লাঠিটাই একমাত্র আপনজন করিম মিয়ার। পশ্চিম পাড়ের তালগাছের ঝাকড়া মাথার ফাঁক গলিয়ে সূর্যের ক্ষীণ অস্তিত্ব দেখা যায়। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে করিম মিয়া। এই তাকানোর বাইরে চারপাশ এখন মৃত করিম মিয়ার কাছে। সু-সজ্জিত এক ভদ্রলোক পাশ থেকে বেশ কয়েকবার করিম মিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। পারে না। শেষে গায়ে ধাক্কা দিয়ে করিম মিয়ার চেতন ফিরিয়ে আনে নিজের দিকে। ঝাপসা চাউনি মেলে জড়ানো গলায় করিম মিয়া জানতে চায়-

কেডা। চিনলাম না তো।

ভদ্রলোকের নিঃশঙ্কোচিত্ত জবাব, জ্বী। আমাকে চিনবেন না। আমি ঢাকা থেকে এসেছি।

কাঁপা কাঁপা গলায় করিম মিয়া বলে, কার কাছে বাবাজী।

আপনার কাছে।

ভদ্রলোকের দিকে ঝাপসা চাউনি মেলে বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে করিম মিয়া আবারও জানতে চায়- আমার কাছে! কি কামে?

জ্বী, অনেক খুঁজে খুঁজে আমি জেনেছি আপনি এলাকার একমাত্র প্রবীণ ব্যক্তি। আপনার বয়স কত হবে এখন বলতে পারেন?

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক বসে পড়ে করিম মিয়ার পাশে।

করিম মিয়া খানিক ভেবে নিয়ে বলে- তা অইব, পাঁচকুড়ি ছয় সাত বছর।

তার মানে আপনি তিন শতাব্দীর পুরুষ! ভদ্রলোকের চোখ চিক্ চিক্ করে উঠে আনন্দে। অবশেষে সে পেল তাহলে। সূর্যের ক্ষীণ অস্তিত্বের দিকে তাকিয়ে বলে,

আপনি কি জানেন চাচা মিয়া, ঐ যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, এটা এই শতাব্দীর শেষ সূর্য। এই সহস্রাব্দের শেষ সূর্য। কাল যে সূর্য অস্ত যাবে সে সূর্য হবে নতুন শতকের, নতুন সহস্রাব্দের।

করিম মিয়া কিছু বুঝতে পারে না। বোকার মতো হা করে তাকিয়ে থাকে ভদ্রলোকের মুখের দিকে। পেটের ভেতর তার ক্ষুধার যন্ত্রণা চিনচিনিয়ে উঠে। ভদ্রলোক অতি বিনীতভাবে বলে- চাচা, আপনি কি কষ্ট করে একবার যাবেন আমার সাথে?

ক-ই যা-মু বাবাজী?

ঢাকায়।

ঢাকায়! ঢাকায় কেন্ যামু?

ঢাকায় মিলেনিয়াম মঞ্চ তৈরী হয়েছে। সেই মঞ্চে নতুন শতাব্দীকে, নতুন সহস্রাব্দকে বরণ করা হবে। দেশের কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবিসহ সকল স্তরের মানুষ বরণ করবে নতুন সহস্রাব্দকে, নতুন শতাব্দীকে। তিন শতাব্দীর একজন পুরুষ হিসাবে আপনিও থাকবেন আমাদের সেই মঞ্চে।

করিম মিয়া বোকার মত জানতে চায়, মাইলেনিম কি?

মিলেনিয়াম মানে সহস্র বছর।

করিম মিয়ার আবার বোকার মত প্রশ্ন-সহস্র কি?

সহস্র মানে এক হাজার। আপনি আমার সাথে চলেন চাচা মিয়া।

করিম মিয়া আপত্তি করে না। জীবনে সে অনেক কিছুই দেখেছে। কিন্তু ঢাকা শহর দেখেনি। ঢাকা শহর দেখার আমন্ত্রণে সে ভুলে যায় ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা, শরীরের ভারসাম্যহীনতার কথা।

ভদ্রলোক করিম মিয়াকে গাড়িতে তুলে নিয়ে রওনা হয় ঢাকার পথে। পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলে গাড়ি। ভদ্রলোক ড্রাইভারকে বলে আরো জোরে, আরো জোরে গাড়ি

চালাও। রাত বারটার আগে ঢাকায় তার পৌঁছানো চাই-ই চাই। শেষ পর্যন্ত বারটা বাজার মিনিট কয়েক আগে যথাস্থানে পৌঁছায় তারা।

করিম মিয়াকে চাঙদোলা করে তুলে নেয়া হয় মঞ্চের উপর। তার এক হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় সাদা কবুতর অন্য হাতে বেলুন গুচ্ছের সুঁতো। করিম মিয়া কিছু বুঝতে পারে না। সামনে হাজার দর্শক শ্রোতা। বিশাল মঞ্চ। চারপাশে আলোর ঝলমলানি। এসব কখনো দেখেনি করিম মিয়া। রাত যখন ঠিক বারটা বেজে এক মিনিট কে যেন পেছন থেকে তার হাত উচুঁ করে সাদা কবুতর উড়িয়ে দেয় আকাশের দিকে। বেলুনগুচ্ছ হাত মুক্ত করে উড়িয়ে দেয় উপরে। মুহূর্তে চারপাশ ফেটে পড়ে ভয়ংকর উল্লাসে। এক সময় মঞ্চে অনেক জ্ঞানী-গুণীদের পাশে বসানো হয় করিম মিয়াকে। মাউথ স্পীকারের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক বলে যায় গত শতাব্দীতে পৃথিবীতে নিজেদের অবদানের কথা। পৃথিবীর উন্নতির কথা। মানুষ এভারেস্টের আকাশ ছোঁয়া চূড়ায় উঠেছে। চাঁদে গিয়েছে। মঙ্গল গ্রহে গিয়েছে। উদ্‌ঘাটন করছে নতুন নতুন গ্রহ, উপগ্রহ, ব্ল্যাকহোল। সাহিত্য, সাংস্কৃতিতে আজ সফলতার জয় জয়কার।

করিম মিয়া অস্পষ্ট সবকিছু শুনতে পায়। কিন্তু সেখানে করিম মিয়ার মাইঝপাড়া নিয়ে কোন কথা শুনতে পায় না। শুনতে পায়না একশ বছরের ভেতর মাইজপাড়ার কোন উন্নতি অবনতির কথা। মানুষ যেখানে মঙ্গল গ্রহে গিয়েছে সেখানে করিম মিয়ারা এখনো সেই ধান ক্ষেতের আল দিয়েই চলাফেরা করে। যেই আল দিয়ে চলাফেরা করেছে করিম মিয়ার বাবারা, দাদারা। দাদার বাবারা। করিম মিয়ার ক্ষুধা চিনচিনিয়ে উঠে। কয়েকজনের কথা বলার পর করিম মিয়াকে ধরে ধরে নিয়ে দাঁড় করানো হয় ডায়াসের সামনে। চারপাশ থেকে বিশেষ অনুরোধ করা হয় তিন শতাব্দীর এই পুরুষকে কিছু বলার জন্য। সবার চোখ নিবদ্ধ হয় সাড়ে ছয় ফিট উচ্চতার এই থুরথুরে বুড়ার উপর।

করিম মিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চারপাশে তাকায়। কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ নিজের অজান্তেই দু'ঠোট ফাঁক হয়ে যায় করিম মিয়ার। জড়ানো গলায় শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার করে বললো,

ভাত দে হারামীর বাচ্চারা।

মুহাম্মদ লাভলু সরকার

# আলোর অন্তিমতা

পারভীন দশম শ্রেণীতে পড়ে, আজ পারভীনের নির্বাচনী পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবে। পারভীনের মন আজ খুব খুশি। কল্পিত ডানায় ভর করে সে উড়ে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের জগতে। আজ তার বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে এবং আজই কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মির্জাপুর উপজেলার এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং আরো অনেক গন্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রথম শ্রেণী থেকে এ পর্যন্ত পারভীন বরাবরই ক্লাশে প্রথম হয়ে এসেছে এবং এবারও সে যথারীতি প্রথম স্থানই অধিকার করেছে। এ সংবাদটি ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছে সে।

পারভীনকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই খুব ভালবাসে। গ্রামের সবাই পারভীনের মাঝে দেখে আশার আলো। মেয়ে হিসেবে পারভীন অতুলনীয়। আজ সে একটু আগেই স্কুলে যাচ্ছে। বাড়ী থেকে বের হয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ সে শুনতে পায়, সামনের কোন একটি বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। পারভীন আরো সামনে হাঁটে, কান্নার শব্দ এবং মানুষের আনা-গোনা আরো স্পষ্ট হয়। পারভীন আরো একটু এগুতেই দেখে তার বড় চাচা ওয়াজেদ আলী এদিকে আসছে। পারভীন তার চাচার মুখে বিষণ্নতার ছায়া দেখতে পায়। চাচাকে দেখে জানতে চায় ঐ বাড়ীগুলোতে এত হৈ চৈ, কান্নাকাটি কেন?

চাচা জানালেন, মা পারভীন, ঐ মিয়া বাড়ীর জমির অনেকদিন অসুস্থ্য থাকার পর আজ সকাল বেলায় মারা গেছে। আহা খুব ভাল লোক ছিল জমির। অন্যের জমিতে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে কাজ করলেও কখনো কাজকে ফাঁকি দিতো না। সে অন্যের কাজকে সবসময় নিজের মনে করে কাজ করতো। অথচ আজ জমির চিকিৎসার অভাবে ছটফট করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। ঘরে তার পাঁচটি ফুটফুটে মেয়ে এবং বউ। ওদের চোখের পানি কিছুতেই বাধ মানছে না। একমাত্র জমিরই ছিল তাদের মুখের আহার যোগানদারী।

অত্যন্ত ব্যথা কাতর এবং অপরাধীর স্বরে তিনি বলতে লাগলেন, আমরা গ্রামবাসী কত নিষ্ঠুর, জমির যখন অসুস্থ ছিল, জমিরের বউ ও মেয়েরা সবার দ্বারে দ্বারে কত ঘুরেছে একটু সাহায্যের জন্য। কেউ এগিয়ে আসেনি।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, তো মা, আমি এখন যাই। তুমি স্কুলে যাও আমি কিছুক্ষণ পর তোমার বাবাকে নিয়ে স্কুলে আসছি। আজ আমাদের উত্তর বাড়ীর মুখ উজ্জ্বল করবে তুমি। এই বলে ওয়াজেদ চাচা চলে গেলেন।

পারভীনের হাসি খুশি মনটা ভেঙ্গে একাকার হয়ে গেলো। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। পাশে একটি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পারভীন। মনে আজ তার হাজার প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। সামান্য কিছু টাকা ও চিকিৎসার কারণে আজ জমির চাচার পরিবারে নেমেছে অন্ধকার। এসব ভাবনায় পারভীনের মন ক্রমেই আরো খারাপ হচ্ছে।

পারভীন সিদ্ধান্ত নিল, "আমি আজ স্কুলে যাবো না"– আবার বাড়ীর দিকে রওনা হলো পারভীন। পথিমধ্যে পাশের বাড়ির পাঁপিয়া খালার সাথে দেখা হয়। খালা জানতে চায়,

পারভীন তুমি স্কুলে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ খালা, গিয়েছিলাম।

এসে পড়লে কেন?

খালা আমার মনটা আজ ভীষণ খারাপ।

কি হয়েছে?

খালা তুমি কি জানো , জমির চাচা আজ সকালে মারা গেছেন।

হ্যাঁ শুনেছি। আমারও খুব কষ্ট লেগেছে। চিকিৎসার অভাবে তাকে আজ জীবন দিতে হলো।

খালা, তুমি কি আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তর দেবে? তুমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করো। তুমি অনেক কিছু জানো। আমি কি বড় হয়ে ডাক্তার হতে পারবো? আমি ডাক্তার হতে পারলে কাউকে আর বিনা চিকিৎসায় মরতে দেব না।

অবশ্যই তুমি ডাক্তার হতে পারবে। আমি দোয়া করি। তুমি একদিন অনেক বড় ডাক্তার হবে।

একথা বলে পাপিয়া খালা তার গন্তব্যের দিকে পা বাড়ায়। পারভীনও বাড়ী চলে আসে। বাড়ী এসে পারভীন কাউকে দেখতে পায় না। উত্তর বাড়ীর সবাই আজ স্কুলে গিয়েছে স্কুলের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান দেখার জন্য। পারভীন নানা ভাবনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিল। এদিকে স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পারভীনের নাম ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে পারভীনকে খোঁজায় সবাই ব্যস্ত হয়ে পরে। পারভীনের মা-বাবা মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে স্কুল থেকে বাড়ী চলে

আসে। এসে দেখে তার মেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। শরীরে তার হালকা জ্বর। খানিকবাদে পারভীনের চাচা ওয়াজেদ আলী আসে এবং দূর থেকেই মা পারভীন, মা পারভীন বলে চিৎকার করে ডাকে। পারভীনের কাছে গিয়ে বলে, মা পারভীন তুমি এখানে। এই দেখো মা, আমাদের এমপি সাহেব তোমাকে সেরা কৃতিছাত্রীর সনদ এবং নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। পারভীন খুব খুশি হয়। বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। বাবা এবং চাচাকে উদ্দেশ্য করে বলে,

আচ্ছা, আমার পুরস্কারের এই টাকাগুলোতো সব আমার।

বাবা বলেন, নিশ্চয়ই।

পারভীন একটু ভেবে নিয়ে বলে, এই টাকাগুলো যদি আমি জমির চাচার পরিবারকে দিয়ে দেই, তাহলে তোমরা কি রাগ করবে?

ওয়াজেদ আলী তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। মেয়েকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বলেন, যে কাজ আমাদের করার কথা সে কাজ তুই করতে চাস, আর এ কাজে তোকে বাঁধা দেবো, এটা কি করে হয় মা। এই বলে ওয়াজেদ আলী চোখ মুছতে থাকেন। একটু থেমে আবার বলেন, আজ যদি আমাদের সমাজ জমিরের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতো, তাহলে জমিরকে বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরতে হতো না।

পারভীনের এখন একটাই স্বপ্ন। সে বড় হয়ে ডাক্তার হবে, ডাক্তার হয়ে এই গ্রামে সে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবে। গ্রামের জন্য পারভীনের খুব মায়া। কথাগুলো পারভীন বলছে পাঁপিয়া খালাকে। পাঁপিয়া খালাকে বার বার প্রশ্ন করে পারভীন, আমি কি সত্যিই ডাক্তার হতে পারবো? তোমাদের মতো করে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবো? পাঁপিয়া খালা পারভীনকে সব সময় সাহস যোগায়। বলে, আমার বিশ্বাস, তোমার স্বপ্ন অবশ্যই সফল হবে।

আর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই পারভীনের এস, এস, সি পরীক্ষা শুরু হবে। মির্জাপুর সদর থানার একটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে পারভীনের সিট পরেছে। পারভীনের গ্রাম থেকে মির্জাপুর সদর প্রায় ২০ কিঃ মিঃ দূরে। তাই পারভীন সেখানে তার ছোট খালার বাড়ীতে থেকে পরীক্ষা দেবে।

কিন্তু পারভীনের মন সেখানে যেতে চায় না। কারণ, প্রায় একমাস পারভীনকে গ্রাম ছেড়ে থাকতে হবে । এটা ভাবতেই পারভীনের বুকের ভেতর কেমন করে। গ্রামের জন্য পারভীনের খুব মায়া।

কাল পারভীনের পরীক্ষা। এখন রাত সাড়ে দশটা। পারভীন বই খুলে বসে আছে। ছোট খালা এসে বললেন, কাল পরীক্ষা, শুয়ে পড়। পরীক্ষার আগের রাতে বেশি

রাত জেগে পড়তে নেই। কিন্তু পারভীনের পড়ায়ও বিশেষ মন নেই, ঘুমও আসছে না। একটাই চিন্তা "ডাক্তার হতে পারবো তো?"

এসব চিন্তা করতে করতে একসময় পারভীন ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ পড়ালেখা করে নাস্তা করে পরীক্ষার হলে যায় পারভীন । পরীক্ষা শেষ হয় দুপুর একটায়। পারভীনের পরীক্ষা খুব ভাল হয়। এমনি করে পারভীনের সবগুলো পরীক্ষা শেষ হয়।

পারভীন আজ বিকেলবেলা বাড়ী যাবে। ওর খুব ভাল লাগছে। পারভীনকে নেবার জন্য ওর বাবা এসেছে। ছোটখালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাবার সাথে রওনা হয় পারভীন। গ্রামে এসে তার হাসিখুশি মনটা মূহূর্তের মধ্যেই ম্লান হয়ে যায়। গতকাল রাতে পাশের বাড়ীর পারুখালা মারা গেছে গর্ভাবস্থায়। তাকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে না নেওয়ায় মারা যায় সে। পারভীন বাবাকে প্রশ্ন করে, পারুখালাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো একজন লোকও কি গ্রামে ছিল না? বাবা ওয়াহেদ আলী কোন কথা বলতে পারে না। অপরাধীর মতো মেয়ের কথা হজম করে চলে। পারুখালার স্বামী ঢাকায় রিক্সা চালায়। পারভীন ভাবে, পারুখালা আমাকে কত ভালবাসতো। আর সেই খালা না জানি কত কষ্টে ছট-ফট করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তাহলে আমরা সমাজে বাস করি কেন?

হঠাৎ একদিন রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে পারভীন। বলে, না না, আমি আর আমার গ্রামের কাউকে মরতে দেব না। পারভীনের চিৎকার শুনে মা-বাবা দু'জনেই পাশের ঘর থেকে মেয়ের কাছে ছুটে আসে। পারভীনের শরীর জ্বরে পুঁড়ে যাচ্ছে। কোন রকমে রাত্রি পার হয়। সকাল বেলা কিছুটা জ্বর কমে। পারভীনকে দেখার জন্য পাশের বাড়ীর পাঁপিয়া খালা আসে। পাঁাপিয়া খালাকে দেখে পারভীন তাকে জড়িয়ে ধরে একই কথা জানতে চায়,

খালা আমি কি ডাক্তার হতে পারবো? আমি আর কাউকে মরতে দেব না খালা।

পারভীনের কথা শুনে পাঁপিয়া খালা চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। একটি ছোট্ট মেয়ে, সে ডাক্তারের বোঝে কি? পারভীন হয়ত বুঝে ডাক্তার হতে পারলে আর কেউ অন্ততঃ চিকিৎসার অভাবে মরবে না। গ্রামের মানুষের প্রতি পারভীনের কত ভালোবাসা, কত প্রেম। তারপর পারভীনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমি তোমাকে দোয়া করি, তুমি অবশ্যই বড় ডাক্তার হবে একদিন। তোমার মত মেয়ে আজ এই সমাজে খুবই প্রয়োজন, তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠ।

পরেরদিন রাতে আবার সেই একই ঘটনা, পারভীনের চিৎকার, আমি আর কাউকে মরতে দেব না। এভাবে কয়েকদিন চলতে থাকে। পারভীনের জ্বর সারে না। গ্রামের এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় পারভীনকে। ডাক্তার দেখে বললো, খুব কঠিন অসুখ নয়, এই ওষুধগুলো খাওয়ান। আশা করি ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু পারভীনের

শরীরের উন্নতি হয় না। দিনের বেলায় জ্বর কম থাকে কিন্তু রাতের বেলা জ্বর সারে না। ওর বাবা মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। পারভীনকে শহরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে ওরা। কয়েক জায়গা থেকে এ ব্যাপারে টাকাও ধার করে পারভীনের চাচা। কবে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। এ চিন্তায় পারভীন আরো অসুস্থ হয়। ওর এখন একটাই ভাবনা, যদি আমার ফল ভাল না হয় তাহলে আমি ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারব না। আর ভাল কলেজে না পড়তে পারলে মেডিকেলে ভর্তি হতে পারব না। এসব নানা রকম চিন্তায় পারভীন আরো অসুস্থ হয়। ক্রমেই পারভীনের অবস্থা ভয়ানক খারাপ হতে থাকে। পারভীন চিৎকার করে মা-বাবাকে ডাকতে পারে না। একা একা খাট থেকে নামতে পারে না। সবাই চিন্তিত হয়ে পরে। হঠাৎ একদিন রক্তবমি শুরু হয় পারভীনের। কান্নায় ভেঙ্গে পরে মার কাছে পারভীন জানতে চায়,

মা, আমার শরীর থেকে সব রক্ত যদি এভাবে ঝড়ে পড়ে যায়, তাহলে আমি বাঁচবো কি করে? মা আমাকে বাঁচাও, বাবা আমাকে বাঁচাও। আমি বাঁচতে চাই, আমি মরব না।

গ্রামের সবাই পারভীনদের বাড়ী এসে ভীড় জমায়। পারভীনকে হাসপাতালে নেয়া হবে। এ জন্য ভ্যান গাড়ী খবর দেওয়া হয়েছে। এদিকে পারভীন শুধু বলছে, মা আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। পারভীনের এই আকুতি-মিনতি গ্রামের সব মানুষের চোখে শুধু অশ্রুই ঝড়াচ্ছে না, গাছপালা, আকাশ, বাতাস, ফুল-ফল, সবার মিনতি আজ পারভীনকে নিয়ে। পারভীন তুমি সুস্থ্য হয়ে উঠ।

পারভীনকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য ভ্যান গাড়ী আসে। ওর মৃত প্রায় শরীরটাকে ভ্যানগাড়িতে তুলে নিয়ে সবাই রওনা হয় হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। কিছুদূর যাওয়ার পর পারভীনের অবস্থা আরো খারাপ হয়। পারভীন চিৎকার করে মাকে বলছে, মা আমাকে বাঁচাও। মেয়েকে খুব শক্ত করে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে পারভীনের মা। পারভীনের শরীর ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে তার মায়ের কোলে। মা বুঝতে পারছে, তার মেয়ের কিছু একটা হচ্ছে। তিনি মুহূর্তের মধ্যে পাথর হয়ে যান। ভ্যান গাড়ী খুব দ্রুত চলছে। ভ্যান গাড়ীতে পারভীনের পাশে বসে আছে তার বাবা ওয়াহেদ আলী, চাচা ওয়াজেদ আলী। হঠাৎ ভ্যান গাড়ী থেমে যায় পারভীনের মায়ের আকাশ কাঁপানো চিৎকারে। বাবা ওয়াহেদ আলী মেয়ের মুখে হাত দিয়ে বলে, মা তুই কথা বল। তোর কি হয়েছে, কথা বলছিস না কেন? দু'চোখ খোল মা, এই বলে ওয়াজেদ আলী আর কোন কথা বলতে পারে না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চাচা ওয়াজেদ আলীও পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা বলতে পারে না। মায়ের বুক ফাটানো কান্নায় আকাশ বাতাস, পশু-পাখি, সবাই যেন সুর মেলাচ্ছে। পারভীনকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হয়। গ্রামের সবাই ছুটে আসে। সবার চোখে অশ্রু। উত্তর বাড়ীতে আজ মানুষের ঢল নেমেছে।

পারভীনের নিস্তেজ শরীরটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল হতে দেবে না ওর মা। তার বারবার একই কথা, না আমার মেয়ের কিছু হয়নি। আমার মেয়ে বড় হয়ে ডাক্তার হবে। তোমরা আমার মেয়েকে নিতে এসেছো কেন? তোমরা সবাই চলে যাও। কাঁদতে কাঁদতে পারভীনের মা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পারভীনকে বরই পাতা দিয়ে গোসল করানো হয়। জোহর নামাযের পর পারভীনকে দাফন করা হবে। এরই মাঝে খবর আসে পারভীনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। সে জিপিএ-৫ পেয়েছে। গ্রাসবাসী পারভীনের স্বপ্নের কথা মনে করে হাউ-মাউ করে কাঁদছে। পারভীনের স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই এসেছে শেষবারের মতো পারভীনকে দেখতে । সবার চোখে পানি। এখনই পারভীনের জানাজার নামাজ শুরু হবে, সব প্রস্তুতি শেষ, হাঁটফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন,

আজ আমার কিছু কথা আছে, আমরা পারভীনের স্বপ্নকে মরতে দেব না। আমরা পারভীনের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবো। এইজন্য আজ আমরা গ্রামবাসী সবাই এই শপথ করবো যে, আমরা আমাদের ঘুমিয়ে থাকা মনুষ্যত্ব বোধকে জাগিয়ে তুলে পারভীনকে বাঁচিয়ে রাখবো। যে বোধ ইতোমধ্যেই পারভীন তার জীবন দিয়ে আমাদের মাঝে জাগিয়ে দিয়ে গেছে।

# ইন্দিরা হক
# যখন ভুল ভাঙলো

অফিসের কোন কাজে মন বসছে না হাসানের। কেমন যেন উদাস উদাস লাগছে। কোন এক অজানা আশংকায় এয়ারকন্ডিশন কক্ষে বসেও চৈত্রের খরতাপের মতো মনের গহীনে চৌচির হয়ে যাচ্ছে হাসানের। বড় স্যারদের রক্তচক্ষু আর ভাল লাগে না। কম্পিউটারের কাজ বিন্দুমাত্র ভুলের জন্য অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু কি করা, এক ভয়াবহ হৃদয় দহনে ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সবকিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা জমে ওঠেছে মনে তার।

বারান্দায় বসে একাকী শুধুই ভাবছে হাসান, একটি ছোট্ট নিরিবিলি সংসার ছিল তার। কিন্তু সংসারে আগুন লাগলো কেন? অতীতের স্মৃতি দৃষ্টির সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে। অদূর গ্রামের মধ্যবিত্ত পারিবারের বি. এ. পাশ করা মেয়ে সুপ্রিয়াকে বিয়ে করে যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছিল সে। গায়ের রং ধবধবে ফর্সা না হলেও সুন্দরী বললে ভুল হবে না তাকে।

হাসান নামেই অফিস পাড়ায় পরিচিত সে। বি. এ পাশ হাসান খুব নম্র-ভদ্র-সৎ এবং কর্তব্য পরায়ন। সদা হাসি খুশি স্বভাবের লোক। ফায়ার ব্রিগ্রেডের অবসরপ্রাপ্ত এক কর্মচারীর মেয়ে সুপ্রিয়াকে বিয়ে করে হাতের মুঠায় যেন সমস্ত সুখ পেয়েছিল। বিয়ের এক মাসের মধ্যে মগবাজারের একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে নতুন বউকে নিয়ে উঠেছিল ঢাকায়।

সুপ্রিয়াও ঢাকায় এসে যেন এক নতুন জগৎ আবিস্কার করল। ঢাকায় রাত্রির সোডিয়াম বাতির আলো আঁধারে কেমন দেখায় তা ও জানল। ঢাকা শহরের বিভিন্ন পার্ক, আহসান মঞ্জিল, চিড়িয়াখানা, সংসদ ভবন, যাদুঘর, রাজবাড়ী এসব বউকে ঘুরে দেখিয়েছে হাসান। প্রথম প্রথম বউয়ের বায়না মেটাতে কোন আপত্তি করেনি। কিন্তু একসময় এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, চাকুরীর সীমাবদ্ধ মাসিক আয় দিয়ে সুপ্রিয়ার মন ভরাতে হিমসিম খেতে হয় তাকে। ধীরে ধীরে সুপ্রিয়া যেন শহরের চাকচিক্যময় ভঙ্গুর জীবনের সাথে পাল্লা দিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এমনি করে তাদের ঘর আলো করে একদিন জন্ম নেয় ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান। হাসান আদর করে তার নাম রাখে অজান্তা। নাম শুনে সুপ্রিয়া বলে, এ নামের অর্থ কি?

হেসে হাসান উত্তর দেয়, নামের অর্থ যাই হোক আমার মেয়ের নাম অজান্তা হাসান। বলেই মেয়ের গালে চুমো খায়। কি যে আনন্দ। না সে আনন্দ বেশিদিন ধরে

রাখতে পারে নি হাসান। ভেবেছিল ঘরে কোন সন্তান এলে সুপ্রিয়া ঘরমুখী হবে, কিন্তু সুপ্রিয়া আরো উদ্দ্যত হয়ে গেল।

ইতোমধ্যে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে ফেলে সুপ্রিয়া, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। আস্তে আস্তে সংসার, সন্তান থেকে দূরে সরে যেতে থাকে সুপ্রিয়া। প্রতিদিন ৯টা ৫টা অফিস, হাজার মানুষের সাথে তার কথার আদান-প্রদান ঘটে। এটাই সে চেয়েছিল। আজ সে আনন্দে আত্মহারা। চলার পথে আসা-যাওয়ার মাঝে পরিচিত হয় একই অফিসের কর্মকর্তা মারুফ সাহেবের সাথে। এখন সুপ্রিয়া অফিস শেষে রিক্সায় বাড়ী ফেরে না, মারুফ সাহেবের দামী গাড়িতে পাশাপাশি বসে বেড়াতে বের হয়। তখন অভূতপূর্ব শিহরণ জাগে তার মনে, আবার ভয়-ভাবনায় ভিতরটা কেঁপে উঠে। আপনি থেকে তুমি সম্বোধনে নেমে আসে এক সময় ওরা।

মারুফ আরও ফ্রি হওয়ার চেষ্টা করে। তোমরা বাঙ্গালী মেয়েরা শুধু জান সংসার। এ ছাড়াও যে জীবনে এনজয় করার অনেক কিছু আছে তা তোমাদের জানা নেই। আমি অনেক দেশে গিয়েছি। সেখানে মেয়েরা যে কতো স্বাধীনভাবে চলে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

সুপ্রিয়ার আনমনা জবাব, দেখুন এটা বাংলাদেশ। স্বামী-সন্তান-সংসার ছাড়া আমরা কিছুই বুঝি না।

মারুফ হেসে উড়িয়ে দেয়, তারপরও তোমার তারিফ করতে হয়। তুমি সেই সংসারকে এড়িয়ে বাইরে এসেছ, এখন দেখবে জীবনের মানে বদলে গেছে।

মারুফের কথায় সুপ্রিয়া মুগ্ধ হয়। তার প্রতি এক ধরনের ভালবাসার জন্ম নেয়। যাওয়া আসার মাঝে দু'জন ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়, ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। মারুফ কথার মোড় ঘুড়িয়ে বলে, ওসব কথা এখন থাক।

একদিন অনেক রাতে বাড়ি ফেরে সুপ্রিয়া। কলিংবেল বাজতেই দরজা খুলে দেয় হাসান। সুপ্রিয়া হাসানের পাশ কেটে ভেতরে চলে যেতে চাইলে হাসানের ডাকে দাঁড়ায়।

হাসান বলে, দাঁড়াও। ঘড়িতে কয়টা বাজে? রাতে না ফিরলেও পারতে। ভাব, আমি কিছু খবর রাখিনা। সারাদিন যার সাথে ঘুরলে ঐ যে ভদ্রলোক মারুফ, তার কাছে থেকে গেলেই তো পারতে।

সুপ্রিয়া ঃ বাজে বকবে না, তোমার মতো আমি অভদ্র নই, এত রাতে তর্ক করতে আমার ভাল লাগছে না।

হাসান ঃ মুহূর্তে হাসানের মাথায় প্রচন্ড রাগ চেপে বসে। বলে, কি! আমি অভদ্র! বলেই জোরে একটা চড় বসিয়ে দেয় সুপ্রিয়ার গালে। রাগে ফুসে উঠে বলে-

একজনের স্ত্রী হয়ে অন্য পুরুষের সাথে রাত ১১টা পর্যন্ত বাইরে ঘুরাঘুরি করে এসে এখন আমাকে ভদ্রতা শেখাও?

একটু থেমে হাসান আবার বলে চলে – এই এক মাসের মধ্যে সংসার সন্তান কারো কোন খোঁজ তুমি রেখেছো? আমি কেমন আছি, কি খেয়েছি, আমাদের সন্তান কেমন আছে এ সবের কোন খোঁজটা তুমি ঠিকমতো রেখেছো? তুমি আছো তোমার অফিস, মারুফ আর তোমার নিজেকে নিয়ে।

খানিক থেমে হাসান আবার বলে, আমাকে স্বামীর অধিকার থেকে ঠকাচ্ছো, সন্তানকে তার মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করছো। কাল থেকে তুমি আর চাকরী করবে না, এটা আমার শেষ কথা।

সুপ্রিয়া ঃ আমি তোমাকে ছাড়তে পারি। তবু চাকরী নয়।

কথাটা শুনে হাসানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। উড়িরচরে ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাসে যেমন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে মানুষকে নিঃস্ব করে ফেলেছিল, হাসানের বুকের ভেতরও তেমনি লাগছে। হৃদয়ে জলোচ্ছাস বইছে, পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শান্ত স্বরে সুপ্রিয়া বলল, আমি চলে যাচ্ছি। এরপর আর তোমার সাথে সম্পর্ক রাখা যায় না।

হাসান স্ত্রীর দুটি হাত চেঁপে ধরে বলে, তুমি মারাত্মক ভুল করছো সুপ্রিয়া। কুয়াশাচ্ছন্ন একটা রাজ্যে তুমি এখন বাস করছো। আমি জানি এ নেশা কাটতে বেশিদিন লাগবে না তোমার। মারুফরা শুধু তোমাদের প্রতি লোভের দৃষ্টি দিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নেয়। সুপ্রিয়াদের সাজানো সংসার তছনছ করে। এর বেশি কিছু করে না ওরা। আমার অনুরোধ রাখ, প্লিজ আমার নিজের জন্য নয়, অজান্তার জন্য তোমাকে বেশি প্রয়োজন।

হাতদুটি প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে ছাড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায় সুপ্রিয়া। ঐদিন দুপুরের মধ্যেই অফিসের ঠিকানায় ডির্ভোস লেটার পায় হাসান।

সুপ্রিয়া আজ মুক্ত। সেকথা মারুফকে জানাতে কয়েকবার ফোন করে। কিন্তু ফোন রিসিভ হয় না। বেবীট্রেক্সী নিয়ে পথ চলতে চলতে নতুন করে কত স্বপ্ন বোনে আর মারুফ ও হাসানের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বেড়ায়। হাসানের কি আছে? মারুফের আছে বিত্ত, বৈভব, ঐশ্বর্য্য আর প্রাচুর্য। যা আমি চাই। নিজের মনের সাথে একাকী আলাপনি সুপ্রিয়ার।

গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সুপ্রিয়া সরাসরি চলে যায় মারুফের অফিস রুমে। একি সেতো নেই। এই সময় তো এখানেই থাকার কথা। টেবিলের উপর চোখ পড়তেই

দেখে একটা খাম, উপরে বেশ বড় করে লেখা "সুপ্রিয়া"। সুপ্রিয়ার মনের ভেতর কেমন জানি অশনিসংকেত নাড়া দেয়। আস্তে আস্তে খামটি খোলে। তাতে লেখা রয়েছে-

*সুপ্রিয়া,*

*তুমি পত্রের ভাষা কিভাবে নিবে জানিনা, তবুও বলবো, গাড়ি, বাড়ি সব বিক্রি করে দিয়েছি। চাকরীটাও ছেড়ে দিলাম। কারণ, আমার নিজের জীবনের চেয়েও আমি আমার মাকে ভালবাসি। তার পছন্দের মেয়েকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। সেই জন্য নিজের দেশ কলকাতায় চলে গেলাম। তবে একটি কথা না বললেই নয়, তোমাদের মত যে সুপ্রিয়ারা প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য্যের মোহে স্বামী-সন্তান ছেড়ে অন্য পুরুষকে ভালবাসতে পারে, আর যাই হোক তাকে বধূ রুপে গ্রহণ করা যায় না। তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধা হলো না। তুমি আমার আশায় থাকবেনা।*

*ইতি-*
*মারুফ*

চিঠি পড়ে সুপ্রিয়া ধপাস করে বসে পড়ে চেয়ারে। শীতের কনকনে ঠান্ডাতেও সাড়া শরীরে ঘাম ঝড়াচ্ছে ওর। চোখে অন্ধকার দেখছে সুপ্রিয়া। একি হলো, কি হবে আমার। মারুফ আমার সুন্দর জীবনটা এমন করে দিল কেন? হাজার প্রশ্ন নিজের ভিতর চূর্ণবিচূর্ণ করে তুলছে ওকে। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যায় মালিবাগে মামাতো বোন শামসুন্নাহারের বাড়ি। বোনকে জড়িয়ে ধরে সব ঘটনা খুলে বলে সুপ্রিয়া।

নাহার ঃ কি করেছিস! তোর সুখের ঘরে নিজ হাতে আগুন দিলি। ছিঃ সুপ্রিয়া ছিঃ। হাসান ভাইকে আমি একবার দেখেছি, ঐ প্রাণবন্তু মানুষটির মূল্য তোর কাছে নাই থাকল। চার মাসের অজান্তার ভবিষ্যৎ কি হবে ভেবে দেখেছিস, জীবন চলার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, তাই ব... লে।

সুপ্রিয়া হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। বলে, চুপ কর নাহার, চুপ ক..র।

নাহার ঃ কেন চুপ করবো, এই সমাজে যতদিন মারুফদের বিচরণ থাকবে, তোদের মত গ্রামের সহজ সরল সুপ্রিয়ারা ততদিন প্রতারিত হবে। যখন ভুল ভাঙবে তখন সব দুয়ার বন্ধ থাকবে।

বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সুপ্রিয়া সামনে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের রেখা দেখে। কাঁদতে কাঁদতে গলার শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসছে সুপ্রিয়ার। দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝড়ছে। কান্না জড়ানো গলায় বলে,

নাহার, অজান্তাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। খু-উ-ব।

ফারহানা তাজকিয়া

# বাসযাত্রী আশফাক

এক

প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে গেল আশফাক বাসটিতে উঠেছে। এখনও বাস ছাড়ার কোন তাড়া নেই। বাসায় যাওয়ার জন্য তার মনটা উড়ু-উড়ু করছে। হেলপার মামাকে কয়েকবার তাগাদা দেয়া হয়েছে এরই মধ্যে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আনমনে আশফাক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ব্যস্ততা দেখে। হঠাৎ তর্ক-বিতর্ক শুনতে পায়। দেখে, তার বিপরীতে একটি সিটের জন্য এই তর্ক চলছে। দেখতে স্মার্ট ও ভদ্র একটি লোক বলছে,

ভাই সিটটি আমার। হঠাৎ প্রয়োজন পড়ায় সিটের উপর বই রেখে আমি নেমেছিলাম একটু। সিটটি ছেড়ে দিন প্লিজ।

অন্যদিকে সিটে বসা মাস্তানের মতো দেখতে লোকটি বলছে, আরে মিয়া শুনেন, এখানে কোন লোক ছিল না, তাই বসছি। আর এটা কি স্কুল কলেজ নাকি, যে বই দিয়ে সিট দখল করবেন?

বই রাখা লোকটি বললো, ভাই এটা কোন কথা হলো। এখানে আমি-ই বসেছি, হঠাৎ প্রয়োজন পরায় একটু নিচে গেলাম।

মাস্তান লোকটি তার দাবীতে অনড় থেকে বললো, বেশি বকবক কইরেন না। এখান থেইক্যা উঠতে পারুম না।

বইওয়ালা লোকটি আর কিছু না বলে সোজা নেমে গেল, যেন যুক্তির এই যুদ্ধে সে যুক্তির কাছে না হেরে শক্তির কাছে হেরে গেল।

দুই

আশফাক আজ আবার বাসে। বাসটিতে যথেষ্ট ভীড়। তারপরেও লোক উঠছে। লোক উঠার কারণও আছে। হরতাল চলছে দেশ জুড়ে। স্বাভাবিক দিনের তুলনায় গাড়ি কম। আজ আশফাককে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। বাস ছুটে চলছে ফার্মগেট থেকে মহাখালীর দিকে। বাস কম বিধায় কালো ধোঁয়াও কম। জানালা দিয়ে অনবরত প্রবেশ করা বাতাসের ঘ্রাণ নিতে খুব একটা মন্দ লাগলো না তার, অবশ্য সাথে বালিকণাও চুলে ক্ষণিকের বাসা বানাচ্ছে। খানিক পরে একটি ছেলে সিট থেকে উঠে আশফাককে বলল, ভাইয়া বসেন। আশফাক জানতে চাইলো, তুমি

কি সামনেই নামবে? ছেলেটির বিনয় ভরা উত্তর, না ভাইয়া, আমি উত্তরা যাব। আশফাক বললো, আমিও উত্তরাতে যাব। ঠিক আছে তুমি বস। মাঝে মাঝে এভাবে যাবার অভ্যাস আমার আছে। কিন্তু ছেলেটির অনুরোধের জোয়ারে আশফাক বসল। পূর্বের ঘটনাটি তার আজ আবার মনে পড়ল। আনমনে হেসে উঠলো এই মনে করে যে, কেউ সিট ছাড়ে মানবতা দেখিয়ে, আর কেউ জোরপূর্বক সিটে বসে মানবতা কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে।

তিন

আশফাক আজ যাচ্ছে গাজীপুরে। উঠেছে উত্তরা থেকে। সিট পেয়েছে। দূরের গন্ত ব্য আরামে যাওয়া যাবে ভেবে স্রষ্টাকে ধন্যবাদও দিল। পরের স্টপেজ থেকে একজন বয়স্ক লোক উঠল বাসে। চুলগুলো তার আধাপাকা। মুখে বয়সের ছাপ, ক্লান্ত দেহ যেন একটু বিশ্রাম পেতে চাচ্ছে। আশফাক উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, চাচা বসেন। লোকটি বিনয় দেখিয়ে বললো, না ঠিক আছে বাবা। আশফাক কোন কথা না শুনে তাকে জোরপূর্বক বসিয়ে ছাড়ল। অত:পর লোকটি বললো-এমন ছেলে দেখা যায় না বাবা। আধুনিক যুগে শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে গেছে। বাসে কেউতো সিট ছাড়েই না বরং উচ্চ ফালতু চর্চা করে যায়। নিরুপায় হয়ে শুনি আর ভাবি, এদের মা-বাবা কি শেখায়? এদের স্কুল কি শেখায়? কারোর যেন দায়িত্ব নেই? লোকটি বলতে লাগল-তোমার বংশ পরিচয় অনেক উঁচু নিশ্চয়ই। তুমি দাঁড়িয়ে যাবে এতে তোমার তেমন কষ্ট হবে না, কিন্তু আমার মত বয়স্ক লোকের জন্য এটা অনেক বড় পাওয়া। বুঝেছ বাবা, শরীর এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে-কষ্ট করতে ইচ্ছে হয়না, শুধু সেবা পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নীতিহীন সমাজে কে কাকে সেবা করবে? সবাই ব্যস্ত, সবাই স্বার্থপর।

চার

প্রায় ১০ বছর পরের কথা। আশফাক এখন একজন কলেজ শিক্ষক। ক্লাশের পড়ানোর সময় প্রসঙ্গক্রমে সে তার জীবনের এই তিনটি ঘটনা ছাত্রদেরকে শোনাল। ছাত্ররা অতি সাধারণ ঘটনা মনভরে শুনলো। ক্লাশে নিরবতা। আশফাক স্যার বলে যাচ্ছেন-এভাবে নৈতিকতার ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিতে হবে তোমাদেরকে। সমাজটা কলুষিত হয়ে গেছে বলে বসে থাকা যাবে না। নিজস্ব সত্তা থেকে ত্যাগের উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। সেই উদাহরণ ঘুমন্ত বিবেকগুলোতে আলোকিত মশাল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে সমাজে, অত:পর দেশে, দেশান্তরে। হয়ত একদিন এভাবে সারাবিশ্বে।

রবিউল আলম ফিরোজ

# একটি লাশের সাক্ষাৎকার

আমি খুব স্বপ্ন দেখি। ঘুমে ঘুমে তো বটেই এমনকি জেগে জেগেও। এক রাত্রের স্বপ্নটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হলো। আমি কবর জগতে গিয়েছি এবং একজন লাশের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। অনুমতির প্রত্যাশায় তাকে প্রথমেই বললাম, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। মানে আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই।

লাশটি খুশি হয়ে বলল, অবশ্যই নিবেন। কারণ জীবিতকালে আমার খুব ইচ্ছা ছিল সাক্ষাৎকার দেয়ার। কিন্তু কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি কিছু।

প্রথম প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে আপনার নাম কি ছিল?

প্রশ্ন শুনেই উনি কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মশাই, আগে আপনার নাম পরিচয়টা বলেন।

অল্প হেসে বললাম, সকলেই বলে আমি স্বপ্নবাজ। আপনি আমাকে "স্বপ্নবাজ" বলেই ডাকবেন।

ঠিক আছে, এবার আপনি প্রশ্ন করুন।

আচ্ছা, আপনি কখনো প্রেমে পড়েছিলেন?

আরে মিয়া বলেন কি? প্রেমে পড়ার জন্যই তো আজ আমার এই দশা।

মানে?

মানে, সুচিত্রাকে আমি খুব ভালবাসতাম। দীর্ঘ সময়ের প্রেম। বলা যায় জীবনে প্রেম উম্মেষের সূচনা পর্ব থেকেই। ও যখন অন্য একজনকে বিয়ে করে সংসারী হলো তখন আমি দুঃখটা সইতে না পেরে সুইসাইড করলাম।

তার মানে আপনি স্বাভাবিক ভাবে মারা যান নি?

না। আমি প্রেমের মরা।

সবাই বলে ত্যাগেই আনন্দ। তাই জানতে চাইছি প্রাণত্যাগ করতে আপনার কেমন লেগেছিল?

হ্যাঁ, ত্যাগেই আনন্দ। কিন্তু প্রাণত্যাগে আনন্দ আছে কিনা আমি তা আগে জানতাম না। তবে প্রাণ দিতে গিয়ে বুঝেছি প্রাণত্যাগে কোন আনন্দ নেই। ডার্লিং যখন বিয়ে

করলো তখন আমি প্রথম মৃত্যুর স্বাদ পাই। সুচিত্রা অপেক্ষা প্রাণত্যাগেও আমি অতখানি কষ্ট পাইনি। অবশেষে বুঝেছি প্রেমিকা ত্যাগ আর প্রাণত্যাগের মত কাজে কোন আনন্দ নাই।

তাহলে আপনি এখন খুব কষ্টে আছেন?

দুনিয়াতেও কষ্টে ছিলাম। লোকজন ওর সাথে আমাকে দেখা করতে দিতো না। দেখা করতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হতো। প্রেমিকা দেখা না দিলে আপনার কেমন লাগে?

সাক্ষাৎকারটা আপনি দিচ্ছেন। আমি না।

ওহ সরি! শেষের দিকে আমি প্রায় উম্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই রেশটুকু এখনও যায়নি। সরি!

তো পৃথিবীতে আপনি কি হতে চেয়েছিলেন?

হতে চেয়েছিলাম অনেক কিছু। যখন গান শুনতাম তখন গানের শিল্পী। যখন ওয়াজ শুনতাম তখন মাওলানা। যখন কবিতা পাঠ করতাম তখন কবি হতে চাইতাম। এমনিভাবে চিত্র দেখে চিত্রকর কখনো আবার হতে চাইতাম চিত্র পরিচালক।

শেষ পর্যন্ত আপনি কি হয়েছিলেন?

লাশ।

আপনার কি আবার পৃথিবীর আলো-বাতাসে যেতে ইচ্ছে করে?

অবশ্যই করে। আমি গড'কে বলে রেখেছি আর একবার ওখানে পাঠাবার জন্য।

কারণটা কি জানতে পারি?

আমি যেন উপযুক্ত হয়ে ওর সামনে দাঁড়াতে পারি। ওকে যেন জীবনসঙ্গী করতে পারি।

আর কোন আশা নেই?

আছে, আমি যেন সন্ত্রাসী হয়ে জন্ম নিই। সন্ত্রাসীকে বিয়ে করতে রাজি না হলে আমি যেন গুলি করে সুচিত্রার খুলি উড়িয়ে দিতে পারি। সেই সাথে আমিও যেন গুলি খেয়ে মরতে পারি। তাহলে আমরা এক সাথে কবর জগতের বাসিন্দা হবো। আমার খুব আনন্দ হবে।

এবার আমার ফেরার সময় হলো। আপনার কাউকে কিছু বলার আছে?

হ্যাঁ। আমার সুচিত্রাকে গিয়ে বলবেন, "আমি এখনও তাকে ভালবাসি। ও যেন সুখে থাকে"।

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

# স্বপ্নঘোর

বসন্তের ছোঁয়ায় প্রকৃতির প্রাণচঞ্চল নব পল্লব বিটপী শ্রেণীর মাঝে। বাগানের শত ফুলগুলো ফুটেছে প্রিয়ার মেঘকালো কেশে পরাব বলে। আকাশও মেঘমুক্ত নেই। অন্ধকার দলছুট মেঘগুলো যেন প্রিয়জনের আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটে চলছে বিরামহীনভাবে। আর আমার ভাবুক মন কেন যেন তাদের এই দুরন্তপনা দেখে নিজেকে বড় বিমর্ষ করছে।

আমি জানিনা আমার কেন এমন হচ্ছে। কোন এক অদৃশ্য ভাললাগার ও ভালবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসের নগ্ন ছোঁয়ায় দেহ-প্রাণ আন্দোলিত করছে মনের পুলকিত বাসনা। এর নাম কি প্রেম, নাকি প্রেমে পরা। ভেবে পাইনা।

এমনি করে সারাটা বিকেল কেটে গেল ছাদে, দূরে দু'চোখ যেদিকে যায় সেদিকে তাকিয়ে থেকে। সন্ধা যখন ঘনিয়ে এল, গোধূলী লগনে সূর্য যখন রক্তিম লাল গোলাপ আকার ধারণ করল আমি ভাবলাম, হয়ত আমার স্বপ্ন সৃষ্টি হবে বলে সে দিবসকে ছুটি দিল নিরব রাত্রির পরশ বুলাতে। বসন্ত পেরিয়ে এখন চৈত্রের আহ্বান তাই প্রকৃতিতে এখন প্রখর রোদের আগমন।

প্রায় প্রতি রাতে বিদ্যুৎ চলে যায়। তাই আমি রাতের আঁধারে আমার প্রিয় বারান্দায় এসে দাঁড়াই, দেখি রাস্তায় অনেক ছোট ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করছে। এটা হল ব্যস্ত শহরের শিশুদের সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে দুরন্তপনা ও অবকাশ যাপন। রাত যখন গভীর থেকে গভীর হতে লাগল কেবল আমি একা নিশাচর প্রাণীর মতো নির্ঘুম থেকে আমার কম্পিউটারের গান শুনছি। এমন করে মনের গভীর থেকে যখন গভীরতম স্থানে চলে গেলাম তখন নিজেকে বড় একা এবং নিঃস্ব সাথীহারা কোন এক বট বৃক্ষের মতো মনে হলো। কেননা বৃক্ষকে কেন্দ্র করে অনেক লোক সমাগম ঘটে অথচ বৃক্ষটি নীরবে একা রয়ে যায়। তাই বারান্দায় চেয়ারে বসে চাঁদের মৃদু মাতাল আলোর পরশ গ্রহণ করছি একান্ত কামনা ভরপুর মনে।

কল্পনায় এক মানবীর ছবি ফুটে উঠে যাকে আমি চিরকাল ধরে চিনি অথচ তার দেখা পাচ্ছি না। সে আমাকে কামনা করে অভিসারের পথে। এমনি করে কল্পনায় এক সময় মনে হলো, সে আমার পাশে বারান্দায় এলো। এলোকেশে গোলাপী রংঙের শাড়ি পরে। আমি ঠিক তার বিপরীত পাশে একান্ত নিমগ্ন চিত্তে আকাশের তারাগুলো গুণে যাচ্ছি বিরামহীন। সে আমার মনোহরণী। তাকে উপেক্ষা করা সে পছন্দ করছেনা। তাই সে বিভিন্নভাবে আমাকে তার দিকে আকর্ষণ করার ব্যর্থ চেষ্টা

করছে। সে বারবার তার শাড়ির আঁচল নিশি রাতের মৃদু বাতাসে উড়াচ্ছে, আর কারণে অকারণে চুড়ির রিনিঝিনি ঝংকার তুলছে। মৃদু বাতাসের ছন্দে যখন সে নিজেই আন্দোলিত হয়ে গুন গুন করে গান গাচ্ছিল ঠিক তখনি আমার নিমগ্ন চিত্ত গভীর ঘোর কেটে উঠল। আর আমার চোখ স্থির হয় বাড়ির সামনে রাস্তার দিকে। দেখি একটা মেয়ে সি এন জি থেকে নামছে। দেখে অবাক হই। একি নারী! নাকি স্বর্গীয় কোন অস্পরী! এত সুন্দর রমণী যে কিনা শত  পুষ্পের চেয়েও অধিক পবিত্র ও সুন্দর। এ মেয়ে এত রাতে এখানে! আমি ভয় পেয়ে যাই। নিশ্চয়ই কোন ভূত! সাথে সাথে আবার নিজেকে সোধরাই, ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি?

ঠিক তখনি সে কলিং বেলের সুইচ পিট দিল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বপ্নঘোর কেটে গেল।

মোঃ মঈদুল ইসলাম

# একটি বোকা ছেলের গল্প

একদিন একটি ছেলে এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে একটা গাছের শিকড়ের সাথে পরে গিয়ে তার পা কেটে গিয়েছে। এমন অবস্থায় তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, ডাক্তার তাকে দেখে বিভিন্ন ঔষুধ খেতে দিলেন আর একটা মলম দিয়ে বললেন,

তোমার যেখানে কেটে গিয়েছে দিনে তিন বার করে সেখানে মলমটা লাগিয়ে দিবা ।

ছেলেটি সেইভাবে কাজ করতে লাগল। দিনে তিনবার করে মলম লাগিয়ে দিতে লাগলো গাছের সেই জায়গায় যেখানে পরে গিয়ে ওর পা কেটে গিয়েছিল। দিনে তিনবার করে নিয়মিতভাবে সেখানে সে মলম লাগাতে শুরু করল। এমন অবস্থায় এক ভদ্রলোক ঐ ঘটনা দেখে ছেলেটির কাছে জানতে চাইল,

এই ছেলে, গাছের সাথে ওটা কি লাগাচ্ছো তুমি?

লোকটির দিকে না তাকিয়েই মলম লাগাতে লাগাতে ছেলেটি উত্তর দিল, কেন? মলম লাগাচ্ছি।

কি জন্য ওখানে মলম লাগাচ্ছো? লোকটি আবার জানতে চাইলো।

ডাক্তার আমাকে বলেছে তোমার যেখানে কেটে গিয়েছে সেখানে এই মলমটা লাগিয়ে দিবা। তাই আমি মলমটা এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। কারণ এই জায়গাতেই আঘাত লেগে আমার পা কেটে গিয়েছিল।

তখন ঐ ভদ্রলোক বলছে, আরে বোকা ছেলে, ডাক্তার কি তোমাকে ঐটা বলেছে নাকি ডাক্তার বলেছে তোমার শরীরের যে জায়গায় কেটে গিয়েছে সেইখানে মলম লাগাতে। তখন ছেলেটা ঐ ভদ্রলোককে উত্তর দিচ্ছে, আরে আপনি বোঝেন না, ডাক্তার আমাকে এটাই বলেছে। তখন ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে ওখান থেকে চলে গেল। ছেলেটা আবারো গাছে মলম লাগাতে শুরু করল। এমন সময় যে ডাক্তার তাকে ঔষুধ দিয়েছিল সেই ডাক্তার ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। এমন কান্ড দেখে ঐ ছেলেকে ডাক্তার সাহেব বলছেন,

আরে বোকা ছেলে, এসব কি করছ? তখন ওই ছেলে ঘুরে তাকিয়ে দেখে যে ডাক্তার ওকে ঔষধ দিয়েছিল সেই ডাক্তার। ছেলেটা ডাক্তারকে দেখে রেগে গিয়ে বলল,

আপনার কোন কথা আমি শুনবনা, কারণ আপনি আমাকে বলেছেন তিনদিন এই মলমটা লাগালেই তোমার ঘা শুকিয়ে যাবে। আর আজ সাত দিন হয়ে গেলো আমার ঘা শুকাচ্ছে না। পা নিয়ে হাঁটতে পারছিনা আমি। আপনার মত ডাক্তারের সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। আপনারা ডাক্তার না, আপনারা হলেন ডাক্তার নামের কলঙ্ক।

তখন ডাক্তার সাহেব ঐ ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন,

আরে বোকা ছেলে, তোমাকে কি আমি এইটা বলেছিলাম যে, তুমি গাছের সাথে মলম লাগিয়ে দিও। তোমাকে বলেছিলাম যেখানে তোমার কেটে গিয়েছে সেখানে মলম লাগিয়ে দিবা। আর তুমি লাগাচ্ছো গাছের সাথে। এতে কি তোমার ঘা শুকাবে? ঐ গাছের সাথে সাতদিন কেন এক বৎসর ধরে বা তারও অধিক কাল ধরে যদি তুমি মলম লাগাও তাহলেও কি তোমার ঘা শুকাবে?

তখন বোকা ছেলেটা ডাক্তারকে আবারো বলছে, আরে আপনিইতো বললেন যে, তোমার যেখানে কেটে গিয়েছে সেখানে মলম লাগিয়ে দিবা। তাইতো যেখানে আমার কেটে গিয়েছে সেখানে লাগাচ্ছি। ঠিকমতো ঔষধ দিতে পারেন না। রোগ ভালো হচ্ছে না আবার কত রকমের বাহানা শুরু করেছেন। যত্বসব। আপনার মত ডাক্তারদের বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারা দরকার।

ছেলেটোর ঐ কথা শুনে ডাক্তার সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, তোমাদের মত রোগীকে বা তোমার মত পাগলকেই গুলি করে মারা দরকার। কেননা তোমরা দেশের সম্পদ না, তোমরা হচ্ছো দেশের বোঝা বা দেশের জন্য অভিশাপ। তোমাদের মত পাগলকে দিয়ে জাতি কি পাবে। তোমাদের বলা হবে একটা করবে আরেকটা। আবার শেষে দোষ চাপিয়ে দিবা অন্যের ঘাড়ে। নিজে পাগলের মতো জ্বলে পুড়ে মরবে আবার অন্যজনকেও মারার জন্য পায়তারা শুরু করবে। তোমাদের মতো পাগল ধ্বংস হোক এটাই জাতির কামনা। তোমরা জাতির বোঝা। জাতির কলঙ্ক। তোমাকে বলেছিলাম, তুমি যে জায়গাতে আঘাত পেয়েছো, যেখানে ক্ষত হয়েছে সেখানে মলম লাগাবা আর তুমি লাগাচ্ছো এসে গাছের সাথে। এখানে গাছের কি কোন ক্ষত হয়েছে, কিংবা গাছের কি কোন জায়গায় কেটে গেছে যে তুমি এসে এখানে মলম লাগাচ্ছো?

বোকা ছেলেটা এবার উত্তর দিচ্ছে,

তো এখন এটা খুলে বলতে পারছেন, আর তখন বলতে পারছিলেন না। তখন বললেন, তোমার যেখানে কেটে গেছে সেখানে লাগিয়ে দিবা। তাই এখানে কেটে গেছে এখানে লাগাচ্ছি। আপনি তো আমাকে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে, তোমার যেখানে কেটে গেছে সেই জায়গা বের কর আর এই ক্ষত স্থানে দিনে তিনবার করে মলম লাগিয়ে দিবা। নিজের দোষ ঘারে নিতে চান না।

ডাক্তার আর কোন কথা না বলে ছেলেটির পাশ কেটে গন্তব্যের দিকে পা বাড়ালো।

কবিতা

## মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতা

# রেণু

ফুলের যেমন রেণু থাকে, আমার তেমন রেণু
আমার রেণু কী করে হয় অন্যের কামধেনু?
কোত্থেকে হায় কী-যে হলো, রেণুর হলো বিয়ে
লাল চেলিতে চললো রেণু, ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
কী আর করি, অবোধ প্রেমিক জানাই বেদনা
প্রবোধ দিয়ে বললো রেণু, অধিক কেঁদো না।
সুবোধ বালক মুছে নিলাম জলভরা দুই আঁখি

সারাজীবন সামনে আমার, মরণটাই বাকি।

# আমার সাহস নেই টোকা মেরে সুন্দরকে উড়িয়ে দেবার

রাইসরিষার মাঠ, ঘাসফড়িং, নদীতীর আর বাতাবিলেবুর প্রহরা এড়িয়ে
এই সাতসকালে, এই অগত্যা নগরে, কেন এলে কেন এলে কেন এলে

এলে যদি, কেন ঘাপটি মেরে বসে পড়লে রঙ্গ-বেরঙ্গের পাখা ছড়িয়ে
আমার দাড়িকাটার আয়নায়, কেন বসে পড়লে কেন বসে পড়লে কেন

আমি এমন কোন ব্রতচারী নই যে হাওয়ায় ধূলিঝড়ে শুদ্ধ করবো আমার মনডানা
আমার হাতের ক্ষুদে কাঁচিখানা আমাকে তাক করে একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে
অথচ তোমাকে তাড়াবার কোন কৌশল আমার আয়ত্তে নেই,
আমার সাহস নেই টোকা মেরে সুন্দরকে উড়িয়ে দেবার

আমাকে অসহায় রেখে দুধারী কাঁচির মতো তুমি একবার খুলে
আবার বন্ধ করলে তোমার অনশ্বর ডানা

তুমি না পাখি না পুষ্প, কংক্রীটের ঘেরাটোপে চুপচাপ বসে আছো স্বেচ্ছাবন্দী
না ফেরেমতা না মানুষ, তোমাকে পাহারা দিচ্ছি আমি রাতকানা দিনকানা

# চুমুক

মাটির ভান্ডে চুমুক দিলাম নূরের মদিরা
তুমি আমার ব্রহ্মশিরা, তৃষ্ণা অধীরা।

## আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

# রক্ত ধরণী

রক্ত ওগো রক্ত
ধরণী তোমারি ভক্ত।
তোমাতেই লেখা
মানবতার মুক্তি
শোষকের পতন
স্বপ্নের সৃষ্টি।

হাবিলের অধিকার হরণের উম্মত্ত নেশায়
রক্তে রঞ্জিত কাবিলের হাত
হাবিলের রক্ত ধারায়
মানব হত্যার সেই সূচনায়।
অধিকার হরণের হাতিয়ার হে রক্ত
হায়েনারা সদা তোমারি ভক্ত।

শিকাগোর রক্তের বৃষ্টি
করে দে'য় পহেলা মে'র সৃষ্টি।
আট ঘন্টা শ্রমের তরে শত মিনতি
দাবাতে চায় বুর্জোয়া শিল্পপতি
চলে গুলি ঝরে রক্ত
শ্লোগানের ধ্বনী হয় আরো শক্ত
রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে আনা সেই অধিকার
কভু নাহি ভুলিবার।

ওরা কেড়ে নিতে চায় মায়ের ভাষা
গুলি চলে রক্ত ঝরে সর্বনাশা
লুটে পড়ে তাজা প্রাণ নিমিষে
সৃষ্টি হয় ফাল্গুন আর একুশে
বায়ান্নের সেই রক্ত
ফোটে  লাল ফুলে
বাংলার ডালে ডালে
প্রতি ফাল্গুনে।

একটি পতাকার লাগি দেশের তরে

সংগ্রাম চলে প্রতিটি ঘরে
একাত্তরের প্রতিটি ক্ষণে
ঝরে পড়ে প্রাণ
লুণ্ঠিত হয় কতো না মান-সম্মান
রক্ত রক্ত রক্ত
তোমারই পথে এ স্বাধীনতা
তুনি বিনা শুধুই অধীনতা।

হে ফিলিস্তিন হে মিন্দানাও
ওরা আজি রক্ত চাহে রক্ত দাও
হে বিশ্ব মানবতা
কতো আর ঘুমাবে তুমি
কতো আর নিরবতা
রক্ত দিয়ে রক্ত নাও
রক্ত নাও আর রক্ত দাও
ছিনিয়ে আনো মানবতার স্বাধীনতা।

ওরা শুধু রক্ত চায়
যদি কিছু পাইতে চাও
তবে রক্ত দাও।
যদি কিছু থেকে বাঁচতে চাও
তবে রক্ত দাও।
রক্ত নাও আর রক্ত দাও।

এ কোন বিশ্ব
কেন হতে হবে
রক্ত দিয়ে নিঃস্ব।
আজি মোরা শান্তি চাই
সত্য চাই
যেখানে কোন মিথ্যা নাই
আমরা আজি তা-ই চাই
যদিও হতে হয় শক্ত
দিতে হয় রক্ত।

আলম তালুকদার

# অনেক ফুল শুকিয়ে যায়

ইচ্ছা করে সব গোলাপ কিনে ফেলি
দোকানে গেলে ইচ্ছাটা মরে যায়
কারণ ইচ্ছারা ভিটামিন না খেয়ে খেয়ে বড় দুর্বল।
ইচ্ছার কোন মা-বাবা নেই
ওদের ডাক্তার নেই চিকিৎসা নেই
ডাক্তার না থাকলে অসুখ থাকে না
তবে সব অসুখ নয়।
ইচ্ছা করে সব ফুল বিলিয়ে দেই
কিন্তু বাকিতে ফুল পাওয়া যায় না
যখন টাকা হাতে পাই
তখন কাউকে কাছে পাই না
সেই থেকে ফুল শুকিয়ে যায়।

**প্রফেসর কামাল আতাউর রহমান**

# আমার কবিতায় তোমার প্রাণ

তুমি বললে, পৃথিবীর স্নিগ্ধতম কণ্ঠে বললে
কবিতা চাই-কালকের মতন আজকেও
এই কথাটি শোনার জন্য গতরাত ছিলাম নিদ্রাহীন
আর আজকের সকাল মনে হোল সুরঙিন, সুরক্তিম

আমার সকল কবিতা তোমাকে লক্ষ্য করে
শুধু তোমার জন্যে
তুমি এমনভাবে কবিতা চাইলে
মনে হোল কবিতা তোমার প্রাণ
আমার কবিতায় তোমার প্রাণ

তোমার সুরেলা কণ্ঠ যখন বাতাসে বাতাসে
আকাশে আকাশে
আমার হৃদয়ের গভীরে মন্দ্রিত
তখন আমার কবিতা পেখম মেলছে
আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় ভরে গেছে মন
শরীরের ভিতরে কি দারুণ চাঞ্চল্য
হৃদয়ের ভিতরে কি গভীর দোলা
সমস্ত পৃথিবীটাকে মনে হোল
সৌন্দর্যে ভরপুর
তোমার হৃদয়ের পাখনায় আমার হৃদয় মেলেছে পাখা
তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা।

মোঃ জাকির হোসাইন

# ভ্রাতৃত্ব

হৃদয় বীনায় ঝংকারে মোর
ক্ষণিকে ক্ষণিকে হায়,
কেমন করিয়া আঁখি পাতা বুজে
প্রাণ পাখি চলে যায়।

তুমি বলেছিলে দুনিয়ার তরে
মানুষের ভেদ নাই,
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান
সকলেই ভাই ভাই।

তোমারি শিক্ষা লইয়া দীক্ষা
করেছিনু আমি বাস,
সংসার মাঝে বাই-বধূ সেজে
যদ্যপি ছিল শ্বাস।

জীবন নদীর তীরে
সন্ধ্যা নামিছে ঘিরে
রূধিবে কে তার দ্বার,
মৃত্যু এসেছে ঘিরে সহস্র বাহু সেজে
করিয়া বিস্তার।

আমার অগ্রেতে যারা হৃত সর্বহারা
হয়ে গেছে খেয়া পার,
বিরহের মালা পরে আমাকেও যেতে হবে
নদীর ওপার।

জাহানারা তালকুদার

# লক্ষ্মী বউ

নামটি মোর জাহানারা
কাজে নেই তাড়াহুড়া
প্রেম করেছি দশটা
জীবন গড়ার চেষ্টা।

প্রথম প্রেম চোখে দেখা
দ্বিতীয়টা ছবি আঁকা।
তৃতীয় প্রেম নেশা-নেশা,
চতুর্থতে অনেক আশা।

পাঁচ নাম্বারকে কাজে লাগাই
ছয়ের থেকে পয়সা বাগাই।
সাতের গাড়ী নিত্য চাই,
আটের সাথে ঘুরতে যাই।

কথা চলছে নয়কে নিয়ে,
দশকে হয়তো করবো বিয়ে।
ভেবে চিন্তে করছি কাজ,
এর মাঝে কিসের লাজ।
আমার মত লক্ষ্মী বউ
হাজারেতে পেয়েছে কেউ ?

## মুহাম্মদ কবির

# নদী এখন শুধুই স্মৃতি

নদীর তীরে বেঁধে ছিলাম একটি সুন্দর ঘর
ঘরটি আমার ভেঙ্গে দিল হঠাৎ এসে ঝর।
নদীর তীরে লিখে ছিলাম কত সুখের কথা
জোয়ার এসে মুছে দিল সবি হলো বৃথা।
স্বপ্ন দেখতাম নদীর বুকে চড়বো নৌকা নিয়ে
ঢেউ এসে স্বপ্ন আমার নিল ভাসিয়ে
নদী তোমায় আপন ভেবে করেছিলাম ভুল
তাইতো আজ নেই আমার জীবনের কোন কূল।
নদী তুমি হৃদয়হীন নেইতো দয়া মায়া
তোমার স্মৃতি কাঁদায় আমায় হয়ে তোমার ছায়া।
নদী তোমার ঢেউয়ের ঝলক বুঝিনিত আমি
তাইতো তুমি ভেঙ্গে দিলে আমার স্বপ্নখানি।
আর কখনও ভেঙ্গনা তুমি কারও সুখের ঘর
এই মিনতি আমি করি তোমারি উপর।

## ইন্দিরা হক

# আমারে পড়ান স্যার

দুইশডা ট্যাহা দিমু
আমারে পড়ান স্যার,
বাজান আমার হইল
রিকসার ডেরাইবার।

আপনেতো জানেন
নাম আমার পট্‌লা–
একলা অংক করলে
মাথায় লাগে জটলা।

মায় কয়, হাউশে বিদ্যা
কিরিপণে ধন,
এইবার কন স্যার
পড়াইবেন কহন?

কতইতো পড়াইলেন স্যার
বড়লোকের পোলা,
আমারে পড়াইলে, পূণ্য
হইবো এত্তগুলা।

মায় কয়, সবাই পারে
তুইও বাবা পারবি,
বড় হইয়া তুই আমার
পরানডা জুড়াইবি।

বড় হইয়া দিমু আমি
মায়েরে সুখ,
এত বড় হমু জানি
বাপের ফুলে বুক।

ভাইবেন-না, ভাইবেন-না
স্যার, আমি খুব ভালা,
তয় কিনা গায়ের রংডা

একটুখানি কালা।

বড় হইলে সালাম দিলে,
করবেন তহন অহংকার,
একটুখানি কষ্ট কইরা
আমারে পড়ান স্যার।।

মোঃ ফজলুল হক আকাশ

# অভিসারে

জানি,
আমার এ কবিতা তোমার কাছে
মূল্য পাবেনা কোন কালে।
নজরুলের প্রেম কিংবা রবী ঠাকুরের
গীতাঞ্জলির ছোঁয়া এতে নেই
আছে শুধু এক বুক বিরহ।

মুখের ভাষা হারিয়েছি তাই
কলমের ভাষায় জানাতে এসেছি
তোমার ধারে।
আমার ভালবাসা যদি ভাল না লাগে
ওগুলো তবু হেলায় ফেলে দিওনা
ঐ পরিত্যক্ত রাস্তার ডাস্টবিনে।

কালের চাকার আবর্তে আমরা
পরস্পরে কাছে এসে ছিলাম
দুরন্ত ঝড়ে আবার হারিয়ে গেলাম।
এতো সুখের ভাষা সইবেনা, তাই
কলমের অশ্রু দিয়ে লিখলাম
দোহাই তোমার অপমান করো না।

একদিন তুমি ছিলে শূন্য মনে
আজ কাকে বসাব আমি সে আসনে।
ক্ষণিকের অভিসারে যদি পড়ে মনে
পড়িও কবিতাখানি পিপাশার তরে
আর জেনে নিও মোর ভালবাসার গভীরতা।

আমি বিরহের মালা বুকে জড়িয়ে
অপেক্ষা করবো তোমার প্রতিক্ষায়
কোন কালে যদি তোমার ভুল ভাঙ্গে
তবে তুমি এসো আমার হৃদয় আধারে।

আবার বাধঁবো বাসা একই ডালে
কাটিয়ে দেব জীবনের বাকী ক'টা দিন
স্বপ্ন মাখা মায়া জালে।

মাহমুদা পররভীন (পুষ্প)

# বিরহ বেলা

তোমাকে দেখিনি
তাই দীর্ঘদিন লিখিনি কবিতা
গানের ছন্দ নিয়েও ভাবিনি কিছু।
বিনিদ্র রাত্রি কেটে গেছে
তোমাকে দেখিনি–
তাই দেইনি চিরুনী চুলে
আয়নায় দেখিনি মুখ
চোখে কাজলও দেইনি ভুলে।
কেটে গেছে রাত্রিদিন - হিসেব করিনি
কতদিন তোমাকে দেখিনি।
তোমাকে দেখিনি-
তাই পদধ্বনি শুনলেই
অপেক্ষায় থেকেছি - এই আসছো তুমি
এক সময় ভেঙ্গেছে ভুল
তুমি আসনি।

উম্মে কুলসুম

# লাল সবুজের পতাকা

২৫ শে মার্চের ভয়াল
কালো রাতে,
এসেছিলো হানাদার
লক্ষ অস্ত্র হাতে।

পড়েছিলো তারা বাঙালিদের
উপর ঝেপে
বাংলা মায়ের সন্তানেরা তাই
উঠেছিলো তাদের উপর ক্ষেপে।

লক্ষ তরুণের তাজা রক্ত
ঢেলে দিয়ে
লাল-সবুজের পতাকা
এনেছে তারা ছিনিয়ে।

মানতে তারা রাজি হয়নি
পড়তে শৃংখল পরাধীনতার
তাইতো আজ ওড়ে বাংলায়
লাল-সবুজ পতাকা স্বাধীনতার।

রওনক জাহান

# শরতে

বর্ষার শেষেতে
শরতের আগমন।
ভোরবেলা শিশিরের
ঝিকিমিকি আলোরণ।

নেই শীত, নেই তাপ
মাঝে মাঝে বৃষ্টি।
সূর্যের কিরণেতে
রংধনু সৃষ্টি।

জলহারা মেঘ ভাসে
আকাশের ঐ কোণে
কদম কামিনী ফোটে
শরতের বনে বনে।

ফুলে ফুলে যায় ছেয়ে
শিউলী তলা।
রয় ফুটে বিলে ঝিলে
শত শাপলা।

সুবাস ছড়ায় ফুল
মিষ্টি বাতাসে।
ছেয়ে যায় নদী তীর
শুভ্র কাশে।

হাসিভরা চাঁদ মুখ
হাজার তারার সাথে,
দেখা দেয় শরতের
নিঝুম রজনীতে।

রাহাত ইসলাম

# আমার ইচ্ছে করে

আমার ইচ্ছে করে হই পাখি
উড়ি ডানা মেলে
আমার ইচ্ছে করে আনি শান্তি
অশান্তি এলে।

আমার ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দেখতে
ঐ নীল আকাশ
বুক ভরে নিতে চাই
বিশুদ্ধ বাতাস।

আমার ইচ্ছে করে হঠাৎ
হারিয়ে যেতে
আমার ইচ্ছে করে ঝরণার কলতানে
উঠতে মেতে।

আমি আজ স্বাধীনতা চাই
যা বাংলার নারীর নাই।
আমরাই পারি নতুন বাংলা গড়তে
আমরাও পারি মহাকাশে যেতে।

মোঃ ফিরোজ হোসেন রিতু

# বাস্তব

বাস্তব বড় নির্মম, বড়ই কঠিন;
সুখ মরীচিকা, কেবলি দুখের দিন
প্রস্ফুটিত হয় দু'নয়নের সামনে।
জীবনের আসমানে, স্বর্ণালী স্বপনে
কল্পনা পরাজিত, ফাটলের রাজত্ব
দেখা দেয়, শুরু করে দখলদারিত্ব।
আবেগ কোন আশ্রয় পায় না হেথায়
নিষ্ঠুর সবি নিজেকে লাগে অসহায়।

ইহাই জীবন, এটাই চরম সত্যি
বসে থেকে কি লাভ পাবে নাতো নিষ্পত্তি;
তাই বাস্তবেরে করে নিতে হয় জয়।
যতকাল বাঁচার সময় কর্মে, শ্রমে
দীক্ষা লও শুভ ধর্মে, উত্তমে, উদ্যমে
যন্ত্রণা নিভিবে হবে শান্তির উদয়।

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

# ব্যবধান

আমি ফুলকে ভালবাসি বলে
তুমি ফুলের কাটার ভয় দেখাও।
আমি বনভূমি ভালবাসি বলে-
আধুনিক নগর সভ্যতার
স্বার্থপরতার লোভ দেখাও।
আমি পাখির কলকাকলি
পছন্দ করি বলে তুমি
পাখিকে খাঁচায় বন্দী করো।
তটিনীর বহে চলা সৌম শান্ত-
স্রোতকে তুমি বল বানের কারণ।
আমি নিয়ে আসি রাত্রির সৌম শান্ত
অন্ধকার, ক্লান্তি নাশিতে শান্তির পরশ।
তুমি প্রভাতী হয়ে কোলাহলে
ব্যস্ত করো নির্জীব জীবন।
আমি তোমায় ভালবাসি বললে
তুমি বল এই ছেলে, তোমার সাহস তো বড়
গগনে চাঁদ তো একটি, আর তারা
লক্ষ কোটি।

মোঃ নজরুল ইসলাম

# ভাগ্যের খেলা

ভাগ্যবানের বোঝা বয় যে খোদা
সে যতই হোক জ্ঞানী।
জীবন যুদ্ধে হয় সে জয়ী,
তাকে যতই করুক অসম্মানী।
দশের চক্রে, ভগবানকে ভূত বলে,
আসলেই সে যে তা নয়।
সত্যকে যতই মিথ্যা বানাও,
সেটা বালির বাধে পরিণত হয়।
সত্যের বাঁধে যতই আঘাত,
সেটা শিশির ঢালা প্রাচীর।
ঝড়, বৃষ্টি, বান যতই আসুক,
সেটা বিলিন হওয়ার নাই নজির।
যার ভাগ্য সেই লিখি,
সেটা অন্য কারও লেখা নয়।
কার্যকলাপে নতি স্বীকার
সেটা মেনে কেহ নাহি লয়।
পার্থিব জগত ততদিন রবে,
যতদিন একজন থাকিবে বীর সৈনিক।
বিপদ, আপদ, আর বালা মসিবতে,
অটুট থাকবে সত্যের প্রতীক।
কর্ম যতই স্বচ্ছ হবে,
ভাল ফল ততই আমল নামায় লেখা পাবে।
জগত মাঝে সব থাকিবে,
কিন্তু তার ফল তোমাকেই
ভোগ করতে হবে।

শহিদুল ইসলাম রনি

# তুমি আমার কবিতা

আজ বুঝিলাম তুমি মোর
কবিতার রাণী।
পঙক্তি বিন্যাস রূপে
চরণে চরণে তোমার ছবি আঁকি।

তোমার লজ্জা রাঙামুখ
আর বৈচিত্র্য ঢঙে।
আমার স্বরলিপির প্রকাশ ঘটে
ওগো আমি অনুসারি তোমার।

তোমার কণ্ঠ মিশে প্রতি অক্ষরে
ছন্দের গীতিময়তা
তোমার সুরে রাঙে
সনেটের সুসংহত ভাবে।

কখ খক, খক খক, গঘ ঘগ, ঙঙ রূপে
শব্দের অনুসঙ্গে তোমার আভাস মিলে
ওগো তুমিই আমার
কবিতা রূপে এলে।

ভিতর জগত বাহির জগত
আধ্যাত্মিক অধ্যায়ে
তুহি রও জাগ্রত
মূল বক্তব্যে।

শিরোনামে যাই লিখি
তাতেই তোমার শব্দ রাজি
তোমার বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ও ভাব কল্পনায়
নামকরণ স্বার্থক হল তাই।

তোমায় ঘিরেই লিখব আমি
আমার জীবন কবিতা
সকল কালের সকল স্রোতে
তুমি আমার কবিতা।

ইরাজ ইকবাল

# অনাস্থা জ্ঞাপন

অবাক তুমি?
এমনতো ভাবিনি!
এমনো কাব্যের মায়াজাল, জানো তুমি!!
ভাবিনি, সত্যিই আমি ভাবিনি!

ভেবেছি-
তোমার ভাবনার উঠোনে
আমার আশ্বাসের ধান শুকোতে দেবে।
শুধু ভেবে ভেবে বেলা হলো সারা।

কি আচানক কথা শোনাও তুমি!
আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি তোমায়–
"তোমার চেতনার গহীন অরণ্যে
তুমি কি নিজেকে খুঁজে পাও?"
না থাক,
চাইনা আমার উত্তর।

তোমার প্রতি নেই কোন অভিমান।
আছে অনাস্থাজ্ঞাপন।
আবারও বলছি-
ভাবিনি, সত্যিই আমি ভাবিনি?

এস ডাবলু সজল

# সৌন্দর্য

সৌন্দর্য তুমি কি?
আমার মায়ের মুখের হাসি
নাকি ক্লান্ত নিঃশ্বাস
সৌন্দর্য তুমি কি?
সুলতানার অবুঝ চাহনি
নাকি আমার দীর্ঘশ্বাস
সৌন্দর্য তুমি কি?
আজ জানব আমি
তাই লিখতে বসেছি।
সৌন্দর্য তুমি কি?
ঘুষের টাকায় গড়া বাড়ির ফুলের বাগানে
জমে থাকা শিশির বিন্দু
নাকি রিক্সাওয়ালার স্বচ্ছ ঘামের বিন্দু।
সৌন্দর্য তুমি কি?
কোটি টাকার দামি গাড়ি
নাকি ফকির বাড়ির খালি হাড়ি।
সৌন্দর্য তুমি কি?
আজ মানব আমি
তাই লিখতে বসেছি।
সৌন্দর্য খুঁজছি আমি আকাশ পাতাল চিরে
সৌন্দর্যের মিথ্যে বিশ্বাস নিয়ে ফিরছি আবার নীড়ে ।

জি কে অভি

# কষ্ট

কষ্ট যার নিত্য সাথী
সুখ কি তার সয়।
জন্ম থেকে জ্বলছি আমি
কত সহ্য হয়।

সুখের আশায় এসেছি আজ
ভিনদেশেতে তাই
এখানেও যে কষ্ট ছাড়া
পাবার কিছু নাই।

তাইতো মাগো বলি আমি
ভাগ্য আমায় দিচ্ছে ফাঁকি।
কষ্টরা আমায় পোড়ায় যখন
সুখের কথা ভাবি তখন।

হয়তো আমার সারাটা জীবন,
দু:খের সাথে করবো বরণ
ভাগ্য আমার হয়েছে ঠিক
তাই আমি নিত্য দুঃখের পথিক।

মোঃ গাজী পিয়ার আহম্মেদ

# এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের
হাজার হাজার প্রাণ,
মুক্ত কণ্ঠে গাই,
অমৃতের গান।

শিক্ষা, শৃঙ্খলা শান্তি দিয়ে
রাখবো এ, ইউ, বি'র সম্মান।
ঐক্য প্রগতির পতাকা তলে
নেব মানুষ হবার চিরব্রত মহান।

মাতৃভূমির সেবার তরে নেব দীক্ষা
মানব প্রেমের নেব মহা শিক্ষা।
হাজার বাঁধার মাঝে ধৈর্য্য নিয়ে
আনবই জীবনের শুভ কল্যাণ।

এখানে মন্দ শিক্ষার্থী আনাগোনা নাই
সকল শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাই।
এ ইউ বি মোদের বিশ্ববিদ্যালয়,
এখানে সভ্যতারী ফুল ফোটানো হয়।

যারা এ ইউ বি'তে জ্ঞানের সন্ধানে আসে,
তারা ফিরে যায় মানবের সেবায় অবশেষে।
এ ইউ বি- এর সকল শিক্ষার্থী গণতন্ত্র মনা
এই আদর্শ আছে কয়জনার  জানা।

ধন্য দেশ ও বিদেশবাসী ধন্য
এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য।
ড.আবুল হাসান মুঃ সাদেক
রণতরীর মত আপনার গতিবেগ,

সালাম আপনাকে হাজার সালাম
আমরাও যেন রাখতে পারি আপনার সম্মান ।

এস. এম. গাজীউর রহমান

# তুমি নও ট্রয়ের হেলেন

১

লেক সিটির লিফটে সেদিন চমকে উঠলাম তোমাকে দেখে
ভাল করে তাকাতেই দেখি তুমি নেই! আমি কি ধাঁ ধাঁ দেখলাম?
একি দেখলাম আমি! আমি কি কীট্‌স এর মতো
স্বপ্ন দেখলাম। মধুমালাকে দেখেছিল তার প্রেমিক
যেভাবে।
জেগে উঠে সে পাগলের মতো তাকে খুঁজতে লাগল।
আমিও রুমে এসে তোমাকে খুঁজতে লাগলাম।
সেই প্রথম পুকুর পাড়ে, পাটের আঁশ ছাড়ানো
কয়েক মহিলার পাশে- তোমাকে দেখে আমি চোখ
ফেরাতে পারছিলাম না।
ভুলে গিয়েছিলাম আমার অবস্থান, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ।
আমাকে দেখে একটা মিষ্টি হাসি হেসে চলে গেলে তুমি ভেতরে।
সেই যে গেলে গেলেই। একেবারেই চলে গেলে।
পড়ার টেবিলে আমি মন বসাতে পারলাম না।
বইয়ের পাতায় তোমার সেই মিষ্টি হাসি। দেয়ালের ছবিতেও তাই–
একি হলো আমার!
আমি ভুলে গেলাম পরীক্ষার কথা, পড়াশোনার কথা।
আর কিছুদিন পরই আমার ফাইনাল।
নাফিজ আমাকে বলেছিল-পড়। মনোযোগ দিয়ে পড়। পরীক্ষায় কিন্তু
হেলেন আসবে না।

২

আমি তোমাকে দেখার জন্য কতবার –
কতবার পুকুরের সেই রাস্তার দিকে নির্ণিমেষ তাকিয়ে থাকি,

সেই কদম গাছের তলে, লিচু তলায়, তোমার স্কুলের
পথে, হাসপাতালের বারান্দায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে
থাকি,একবার তোমার দেখা পাবো বলে। সেদিন তোমার
পরনে ছিল লাল জামা, সাদা পাজামা, সাদা ওড়না। তারপর থেকে
এই পোষাকের কাউকে দেখলেই মনে হয় তুমি।
তোমাকে দেখার জন্য আমি নীলক্ষেত গেলাম, খিলক্ষেত
গেলাম। শুধু একবার যদি দেখা হয়।
ক্লিওপেট্রার জন্য এন্টনি যেমন বলেছিলেন
"টিবার নদীতে রোম ডুবে যাক, এখানেই আমার সব।"
বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিশন টেস্টে
আবার তোমাকে দেখলাম। একি? তোমাকে চিনতে
পারছিলাম না। তুমি অনেক মোটা হয়ে গেছো।
সেই কদমের ছায়াতে যাকে দেখেছিলাম একদিন।
এই কি সেই? ভাবতে ভাবতে আমার রাত কেটে যায়, দিন কেটে যায়।
নামাজের সময় মনে পড়ে, ডাইনিং টেবিলে মনে পড়ে
সবাই খেয়ে উঠে যায়, আমি পিছনে পড়ি।
সেই মুখ, সেই ঠোঁট, সেই চোখ, সেই হাসি
আমি ভুলতে পারি না। চন্ডিদাসও ভুলতে পারেনি।
তুমি তো চন্ডিদাস গাঁতী হয়েই যাও।
তোমার কি কখনও মনে পড়ে? চন্ডিদাসের কথা? তুমিতো বাংলা
সাহিত্যের ছাত্রী। মনে পড়ে কাউকে দেখে একবার
হেসেছিলে? আমি কিন্তু কখনও বলতে পারিনি
তোমাকে ভালবাসি।

৩

তোমার প্রতি আমার গভীর অনুভূতি টের পেয়েছিলে তুমি
হঠাৎ একদিন তোমার আম্মা আমাকে বললেন-
মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা কর, সময় আসুক।
আমি যেনো সব আগ্রহ হারিয়ে ফেল্লাম। কথাটা
তোমার কাছ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম।

চৌধুরী পাড়ায় থাকার সময় একবার তুমি মালিবাগ এসেছিলে।
কত ছুতায় আমি সেখানে গিয়েছিলাম, তুমি একবারও কাছে আসনি।
আমিতো বিবিএ'র ছেলেটার মতো বলতে পারিনি
"ভালবাসা দাও, নইলে এসিড ছুড়ে মারবো।"
এটা কি বলা যায়? কারো মন কি জোর করে আদায় করা যায়?
জসীমউদ্দীন রোডে হঠাৎ আবার দেখা তোমার সাথে
মনে হলো তুমি সুখে নেই।
বাংলাদেশের উত্তরে পাহাড়ের পাদদেশে থাক তুমি, সেখান থেকে
এত কষ্ট করে তুমি এসেছো; কেন এসেছিলে ঢাকায়?
এই উত্তরায়! ভাবতে ভাবতে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি
আমি ফসটাস হয়ে যাই
হেলেনকে দেখে যেমন তিনি বলেছিলেন,
'ডধং ঃযরং ঃযব ভধপব ঃযধঃ
খধঁহপযবফ ধ ঃযড়ঁংধহফ ংযরঢ়ং?"

**৪**

অটই-এর সামনের রাস্তা পাড় হতেই আবার দেখলাম তোমাকে,
ইঘঝ থেকে নামছো। একি তোমার পোষাক!
স্যান্ডো গেঞ্জি, আর থ্রি কোয়ার্টার।
না তুমি নও! তোমার মেয়ে! এক ঝলক তাকাতেই বুঝলাম-
হ্যাঁ তোমার মেয়ে।
সেতো জানে না তোমার জন্য আমার হৃদয়ে এখনও
রক্ত ক্ষরণ হয়।
এখনও সকল কাজ ফেলে আমি চিন্তা করি- কেন
বলতে পারিনি-
"ঐড়ষফ ুড়ঁৎ ঃড়হমঁব ধহফ ষবঃ সব ষড়াব"
আমি এখনও ভালবাসি তোমাকে
তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমি আনমনা হয়ে পড়ি,
পড়ার টেবিল ছেড়ে বেলকনিতে এসে বসি
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার মিট মিট করে জ্বলতে থাকা

লাইটের দিকে তাকিয়ে থাকি। তোমার মুখের সাথে আরও
কত মুখ ভেসে উঠে। পলি, ডলি, মিলি।
রাত এখন চারটে, নিশ্চয়ই তুমি সুখ নিদ্রায় বালিশের কোলে মাথা রেখে
আমি এখনও ভালবাসি তোমাকে।
হ্যাঁ শুধু তোমাকে।
তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টা কর, আমার দিকে তাকাও-
শুধু তোমার জন্য আমি এখনও নতুন নতুন শার্ট পড়ি
ইস্ত্রি করি প্যান্ট, বাসে চড়ে ভার্সিটিতে যাই
তোমাকে খুঁজি।
চল্লিশটা বছর ধরে তোমাকে খুঁজছি,
আরো হাজার বছর ধরে খুঁজবো।
শুধু তোমাকে।।

**অনুবাদকঃ মোঃ শফিউল আজম**
**মূলঃ উইলিয়াম ব্ল্যাইক**

# ভালোবাসার কথা বলতে যেওনা কখনো

***লেখক পরিচিতি ঃ*** *উইলিয়াম ব্ল্যাইক ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে ১৭৫৭ সালের ২৮ শে নভেম্বর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক সমালোচকই ইউলিয়াম বেইককে রোমান্টিক যুগের অন্যতম কবি হিসেবে বিবেচনা করেন। উইলিয়াম কখনোই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, তিনি ছোটবেলায় তাঁর মায়ের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কররেন। কিন্তু তাঁর লেখায় চিন্তাশক্তির গভীরতা দেখে অবাক হতে হয়। "ভালোবাসার কথা বলতে যেওনা কখনো" কবিতাটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল কবিতাটির নাম* ***ঘবাবৎ ঝববশ ঃড় ঞবষষ ঞযু খড়াব.***

খুঁজোনা কাউকে বলতে কথা ভালোবাসার
বলা কি যায় কখনো, কথা ভালোবাসার?
দেখোনা স্নিগ্ধ বাতাস যায় বয়ে,
নীরবে, কারো কানে কথা না কয়ে।

আমি বলেছিলুম, আমি বলেছিলুম তাকে
বলেছিলুম উজাড় করে পুরো হৃদয়টাকে
বলেছিলুম মৃত্যুসম ভয়ে, শীতে কম্পমান
আহা! তবু কি ঠেকানো গেলো তাহার প্রস্থান?

আমা হতে যেতে না যেতে
আগন্তুক এলো এক কোথা হতে?
নীরবে, দর্শনাতীতভাবে
নিয়ে গেলো তারে, কতো না সহজে!

অন্যান্য

সালমা পারভীন

# ভিক্টোরীয় যুগের ব্রন্টি পরিবার

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে ভিক্টোরীয় যুগের (১৮৩২-১৯০১) অবদান অনন্য সাধারণ। এই যুগের সাহিত্যে আমরা পাই শান্তি, শৃঙ্খলা এবং স্থায়ীত্ব। আমরা পাই কল্পনা এবং সত্যের দ্বন্ধ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্ধ, বিশ্বাস ও সন্দেহের দ্বন্ধ। এছাড়াও এই সময়ের সাহিত্যে আমরা পাই পুরাতন ও নতুনের তুলনা, মুক্তিকামী ও পরাধীন মানুষের তুলনা। এই সব কিছুই আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এজন্যই হয়ত ভিক্টোরীয় যুগে রচিত হয়েছে কিছু অনন্য সাধারণ জীবনধর্মী উপন্যাস। এ সব জীবন ধর্মী উপন্যাস আমাদেরকে যাঁরা উপহার দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে দু'জন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন ব্রন্টি পরিবারের।

আইরিশ পাদরি প্যাট্রিক ব্রন্টির পাঁচ কন্যা ও এক ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে শার্লট ব্রন্টি (১৮১৬-১৮৫৫), এমিলি ব্রন্টি (১৮১৮-১৮৪৮) এবং এ্যানি ব্রন্টি (১৮২০-১৮৪৯) এই তিনজন ছিলেন লেখালেখির সাথে জড়িত। এঁদের প্রত্যেকেই ইয়র্কশায়ারের হাওয়ার্থ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব্রন্টিদের বাবা প্যাট্রিক ছিলেন কড়া মেজাজের মানুষ। এছাড়াও তাঁদের মা মারা যাওয়ার পর তাঁরা যে খালার কাছে মানুষ হয়েছিলেন তারও মেজাজ খুব একটা সহানুভূতিশীল ছিল না। ফলে ব্রন্টিরা সুযোগ পায়নি সমাজের অন্য ছেলেমেয়ের সাথে মেলামেশা করার এবং বহির্জগত সম্পর্কে জানার।

যদিও প্যাট্রিক ব্রন্টির একটা সৎ ইচ্ছা ছিল। সেটা হচ্ছে তিনি ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংসারের অভাব-অনটনের জন্য অনেক কষ্টে তাঁদেরকে বিদ্যা অর্জন করতে হয়েছিল। জীবিকার জন্য তাদেরকে মাঝে মাঝে স্কুল শিক্ষয়িত্রী বা গৃহ শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতে হয়েছে। শার্লট, এমিলি এবং এ্যানি এই তিনজনের প্রত্যেকে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও এ্যানি অসুস্থতায় মারা যান ১৮৪৯ সালে উল্লেখযোগ্য কিছু রচনার আগেই। তারও এক বছর আগে ১৮৪৮ সালে মারা যান এমিলি কিন্তু তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "উইদারিং হাইটস"। শার্লট ব্রন্টির জীবনের ব্যাপ্তিকালও খুবই ছোট, তিনি মারা যান ১৮৫৫ সালে।

## শার্লট ব্রন্টি

শার্লট ব্রন্টির রচনার মধ্যে তাঁর বিখ্যাত এবং প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হলো "জেনে আয়ার"। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। এরপর "শার্লে" (১৮৪৯), ভিলেট

(১৮৫৩) এবং সবশেষে "দি প্রফেসর" (১৮৫৭) সালে প্রকাশিত হয়। যদিও "দি প্রফেসরই" ছিল তাঁর প্রথম রচনা।

শার্লট ব্রন্টির রচনায় আমরা গভীর জীবন তত্ত্ব খুঁজে পাই না। তাঁর লেখাগুলোকে আমরা তাঁর জীবনের আয়না বলতে পারি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "জেনে আয়ার" কে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব এটা তাঁরই জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র জেনে আয়ার, যার মাধ্যমে শার্লট ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর জীবনের অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-ভাবনা। "জেনে আয়ার" পড়লেই বোঝা যায় শার্লট জীবনে কি চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মুক্তিকামী একজন নারী, এমনকি এই উপন্যাস পড়ার পর তাঁকে নারীবাদী বললেও ভুল হবে না। এই উপন্যাসে তিনি তাঁর যুগের নারীদের অবস্থান শ্রেণীভেদে চমৎকার করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ব্রন্টিদের সময়ে নারীদের পড়াশোনার দৌড় খুব বেশি দূর পর্যন্ত ছিল না। তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সামান্যই পেত, তার পাশাপাশি নাচ, গান, চিত্রাংকন কিংবা কিছু বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখত। এই সময়ের নারীরা চাকরী হিসাবে পেত গভার্নেস অথবা নার্সের কাজ। প্রকৃতপক্ষে, তাদের মূল কাজ ছিল ঘর-গৃহস্থালীর কাজ। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগের শেষের দিকে এই অবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং এই উন্নতির সূচনা হয়েছিল ব্রন্টীদের সময় থেকেই। এই সময়ের অনেক লেখক তাঁদের লিখার মধ্যে নারীদের অবস্থান ভিন্নভাবে দেখাতে চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শার্লট ব্রন্টি অন্যতম একজন। আর "জেন আয়ার" হচ্ছে শার্লট ব্রন্টির সেই বই যার মাধ্যমে তিনি দেখালেন নারীরা শুধু ঘর-গৃহস্থালীর কাজই করবে না, শুধু গভার্নেস বা নার্সের কাজই করবে না; তাদেরও অনেক কিছু করার আছে এবং তাদের জন্ম শুধু পুরুষের অধীনস্ত থাকার জন্য নয় বরং তাদের বন্ধু হবার জন্য।

## এমিলি ব্রন্টি

ব্রন্টি পরিবারের আর সবার মতো এমিলি ব্রন্টিরও বাইরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল খুবই সংকীর্ণ। আর জ্ঞান যা ছিল তা ছিল বই নির্ভর। যার কারণে বই নির্ভর জ্ঞানের উপর কল্পনা করে তাঁকে লিখার উপকরণ খুঁজতে হয়েছে এবং সেই কল্পনার জগৎ প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সফলও হয়েছেন। তাঁর তিরিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের একমাত্র বিখ্যাত উপন্যাসটি হচ্ছে "উইদারিং হাইটস"। এই উপন্যাস তাঁর কল্পনা প্রবণতার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো হিথক্লিফ। হিথক্লিফ একজন কৃষ্ণাঙ্গ, অসংযত, অসামাজিক, কঠোর মনের মানুষ, যাকে মিস্টার আর্নশ ছোটবেলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এবং ছেলের আসনে বসিয়েছিলেন। হিথক্লিফ কৈশরে ক্যাথরিন আর্নশের প্রেমে পরে এবং ক্যাথরিনের যখন এডগার লিনটনের সাথে বিয়ে হয়ে যায় তখন সে ক্ষোভের তাড়নায় সব লন্ডভন্ড করে ফেলে। এই উপন্যাসে আর একজনও নাই যার সাথে হিথক্লিফের তুলনা করা যায়। হিথক্লিফ শুধু

আবেগাপ্লুত প্রেমিকই নয় বরং প্রতিশোধ পরায়নও। হিথক্লিফ একসময় সফলভাবে আর্নশ এবং লিনটন পরিবারের সম্পত্তি করায়ত্ত করে। কিন্তু এরপরে সে শান্তি পায় না। ক্যাথরিনের মৃত্যুর পর সে তার নিজের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ক্যাথরিনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য।

সুতরাং শার্লট ব্রন্টির "জেন আয়ার" এবং এমিলি ব্রন্টির "উইদারিং হাইটস" উপন্যাস দুটি একই সময়ে রচিত এবং একই সালে প্রকাশিত। কিন্তু উপন্যাস দুটির গল্প এবং চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা শুধু ভিক্টোরীয় যুগেই নয় এখন পর্যন্ত জনমনে প্রবল প্রভাব ফেলতে সক্ষম। তাই আমরা বলতে পারি শার্লট ব্রন্টি এবং এমিলি ব্রন্টি ভিক্টোরীয় যুগের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

জে সি ফুলকুমার

# আমি এবং আমার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। রেজাল্টও ভাল হয়েছে। তাই সবারই ইচ্ছে বাজার চাহিদা সম্পন্ন কোন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করি। এতে করে ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করা যাবে। কিন্তু আমার মন পরে আছে সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করার প্রতি। এবং সেটা অবশ্যই ঢাকা থেকে। কারণ, ঢাকার সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে পরিচিত হওয়ারও দারুণ ইচ্ছে আমার। মাঝে মাঝে গল্প কবিতা লিখি আমি। কি করবো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। অবশেষে বাবা মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চলে এলাম ঢাকায়। ইতোমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। কোন কলেজ থেকেও পড়ার ইচ্ছে নেই আমার। কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিলাম। কিন্তু অনার্স এবং মাস্টার্সের খোঁজ কোথাও পেলাম না। হতাশাপূর্ণ মন নিয়ে চলে গেলাম নরসিংদী মামা বাড়িতে। মামা বললেন, নরসিংদী কলেজ থেকে আশা পূর্ণ করতে। কারণ, নরসিংদী কলেজে বাংলা সাহিত্যে অনার্স এবং মাস্টার্স আছে। মামার বাড়ির আদরসহ আরো অনেক কিছুর লোভ দেখালেন। কিন্তু আমার মন পড়ে আছে ঢাকায়। নরসিংদী থেকেই ফোনে আরও কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নেই এ ব্যাপারে। অবশেষে ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"এ আমার কাংখিত বিষয়টি খুঁজে পাই। আনন্দে আত্মহারা আমি।

আমার বাড়ি রংপুরে। ওখানে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির কথা অনেক শুনেছি আমি। রংপুরের অনেকেই পড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির নামই বেশি মুখে মুখে রংপুরের মানুষের কাছে। কিন্তু এত

নামকরা ইউনিভার্সিটি এখানে বাংলা সাহিত্যে অনার্স-মাস্টার্স আছে এটা ভাবতে পারিনি। কারণ, বাংলা সাহিত্যে পড়াশুনাকে কেউ সম্মানজনকভাবে দেখে না। সবাই ভাবে যারা অন্য কোন বিষয়ে পড়ার সুযোগ না পায় তারাই বাংলায় পড়তে আসে। অথচ এত নামকরা একটি ইউনিভার্সিটিতে বাংলা আছে এটা জেনে আমি আনন্দে আত্মহারা।

পরদিনই নরসিংদী থেকে উত্তরায় চলে আসলাম এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে। বাংলায় ভর্তি হওয়ার জন্য ফরম কিনলাম। ইনফরমেশন অফিসের সামনেই বাংলা বিভাগের অফিস। কয়েকজনের সাথে কথা বললাম। কথা বলে মন আমার আবারও নতুন একটি সংবাদে আনন্দে আত্মহারা হলো। সেটি হলো, এখান থেকে নাকি প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা। আহ! কি আনন্দ। সাহিত্য সাংস্কৃতিক জগতটিকে আমি খুবই পছন্দ করি। মনে হলো আমার মনের সব চাহিদা এখান থেকে পূর্ণ হওয়ার সুযোগ পেলো।

আমি ভর্তি হলাম। এখন নিয়মিত ক্লাশ করছি। অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশ। নিয়মিত ক্লাশ হচ্ছে। নতুন নতুন বন্ধু। বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে এসে ভর্তি হয়েছে ওরা। খুবই আনন্দে সময় কাটছে আমার। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ড. রিটা আশরাফ আমাদের বাংলার শিক্ষক। ওনার সাথে আমাদের ক্লাশ হয়। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমাদের কার কতটুকু সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিভা আছে সেটি খুঁজে খুঁজে বের করেন। এত ভাল লাগে আমাদের। সম্প্রতি তিনি বলেছেন একটি বার্ষিক সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন। শুনে মন আমার আকাশে উড়ে গেল। আমি অবশ্যই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবো এবং একাধিক বিষয়ে। আমি ভাল গান গাই। প্রতিযোগিতায় বিচারকগণ আমার গান শুনবেন, মন্তব্য করবেন, ভাবতেই আমার ভাল লাগে।

নরসিংদী মামা বাড়ি থেকে এসে আমি ক্লাশ করি। প্রতি শুক্র ও শনিবার সপ্তাহে এই দুদিন ক্লাশ হয়। এটিও খুবই পছন্দের আমার। অন্যান্য দিন আমি মামার সাথে কাজে সহযোগিতা করতে পারি কিংবা লেখালেখিসহ অন্যান্য কাজ করতে পারি। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে যখন আমি বাসে, রিক্সায় উঠি কিংবা রাস্তায় চলাফেরা করি গর্বে বুক ভরে যায় আমার। আমি এখন বেশ আছি। মহা আনন্দে এখন সময় কাটে আমার। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি আমার স্বপ্নের সকল দ্বার খুলে দিয়েছে।

মুহাম্মদ জুবায়ের রহমান চৌধুরী

# গ্রন্থাগার জ্ঞানে সঞ্চয়িনী

১.

বই জ্ঞানের আধার, জ্ঞানের সঞ্চয়নী। সভ্যতার অন্যতম উপাদান হলো বই বই এবং বই। খাদ্য যেমন দেহের পুষ্টির যোগান দেয় তেমনি বই মনের খাদ্যের প্রধান খোরাক। তাই সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে অদ্যাবধি মানবজাতির অর্জিত সকল জ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে গ্রন্থ রচনা ও প্রণয়নের মাধ্যমে। আর গ্রন্থগারসমূহ সংরক্ষণ ও পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞানার্জনের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

গ্রন্থাগার যে একটি জাতির মেধা, মনন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ ও লালন-পালনকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তা অনস্বীকার্য। এ কথাটি কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, মানুষের জ্ঞান আহরণের প্রধান উৎস গ্রন্থ । আর গ্রন্থাগার হচ্ছে গ্রন্থের আগার বা সংগ্রহশালা। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যে ভূমিকা এক কথায় তার কোন বিকল্প হতে পারে না।

২.

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কোন মানুষের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সবশ্রেণীর মানুষই উপকৃত হয়। কম লেখাপড়া জানা লোক, ধনী-গরীব এমনকি জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন গবেষণার জন্য গ্রন্থাগারের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থাগারের প্রধান সুবিধা হচ্ছে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন লেখকের বিচিত্র সব বিষয়ের ওপর রচিত গ্রন্থ এক জায়গায় পাওয়া যায়।

৩.

জ্ঞান পিপাসু পাঠকের জন্যে গ্রন্থাগার জ্ঞানার্জনের যে সুযোগ করে দেয়, সে সুযোগ অন্য কোথাও পাওয়া মুশকিল। গ্রন্থাগার গ্রন্থের বিশাল সংগ্রহশালা, যা কোন পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম। গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই মানুষ জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করে জ্ঞানের মণিমুক্তা সংগ্রহের সুযোগ পায়।

৪.

গ্রন্থাগারের ইতিহাস বেশ পুরনো। মানুষের পড়ার আগ্রহ থেকেই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। মানুষের অনুসন্ধানস্পৃহা, নব নব প্রাপ্তির আনন্দ-নেশায় উৎফুল হয়ে উঠে।

এরূপ ক্রমলব্ধ জ্ঞান স্মৃতি শক্তিতে ধরে রাখা একসময় অসম্ভব হয়ে উঠে। মানুষ জ্ঞানলব্ধ ও সংগ্রহীত জ্ঞান স্থায়ীভাবে ধরে রাখার মাধ্যম খুঁজতে থাকে। গাছের বাকল, পাহাড়ের গা, প্যাপিরাস, চামড়া, পাথর, বাঁশ ইত্যাদির ব্যবহার আয়ত্ত করে। ফলে মানুষের জ্ঞান ভান্ডার বিস্তৃতি থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে। ক্রমবিস্তৃত জ্ঞান ভান্ডার নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এক সময় মানুষ অনুভব করে। এ অনুভব থেকেই তাঁরা নিজ নিজ ঘরের কোণে, মন্দির-উপাসনালয় এবং রাজকীয় ভবনে সংরক্ষণ করতে শুরু করে।

৫.

প্রাচীন রোমে প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্যে ক্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। রোম ছাড়াও প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, মিশর, চীন, ভারত ও তিব্বতেও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে মুসলমানদের শাসন আমলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সভ্যতার ইতিহাসে স্পেনের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশটি বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের মিলনমেলার তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

৬.

গ্রন্থাগারের উপযোগিতা নিয়ে সন্দেহ কিংবা সংশয়ের কোন সুযোগ নেই। গ্রন্থাগার জ্ঞান আহরণের সহজ মাধ্যম। আমাদের মতো গরীব দেশে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ যে দেশে মৌলিক চাহিদা পূরণে মানুষ হিমশিম খাচ্ছে সে দেশে বই কিনে পড়ার কোন সামর্থ থাকার কথা নয়। আর থাকলেও তা নিতান্তই সংখ্যায় হাতে গোনা। তাই আমাদের পক্ষে বই কিনে পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ব্যাপক।

৭.

শিক্ষার সাথে আনন্দের সংযোগ না থাকলে সে শিক্ষা মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করতে অক্ষম প্রায়। কারণ সুশিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় এবং জ্ঞানকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা পদ্ধতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে পাঠ্য বইয়ের বাইরে যাবার কোন স্বাধীনতা শিক্ষার্থীদের নেই। এ পদ্ধতি তাকে স্বশিক্ষিত তো করেই না, বরং স্বশিক্ষিত হবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়। কিন্তু গ্রন্থাগার সবার জন্যই মুক্ত ও অবাধ। পড়বার স্বাধীনতা এখানে অফুরন্ত। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন-

"আমি লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায়, স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রূচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে, জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে"।

৮.

সুতরাং কেবল ছাত্রই নয়, সকল পেশার মানুষের জ্ঞান অর্জনের সুযোগের মাধ্যমে জাতির প্রাণ শক্তির বৃদ্ধির জন্য স্কুল-কলেজের মতো গ্রামে-গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি।

# এশিয়ান ইউনিভার্সিটি সাহিত্য পত্রিকা
# প্রথম সংখ্যা সম্পর্কে পাঠক মতামত

## ড. রহমান হাবিব

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর সাহিত্য বিষয়ক মুখপত্র 'সাহিত্য পত্রিকা' ১ম সংখ্যা (জানুয়ারি-জুন-২০০৯) প্রকাশিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। ধন্যবাদ নয় শুধু; তাঁরা কৃতজ্ঞতা পেতে পারেন এজন্য যে,বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনাময় তরুণ লেখকদের লেখকসত্তাকে জাগ্রত করার প্রয়াস এতে চিহ্নিত বলে। পঞ্চাশ অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত এই পত্রিকাটিই প্রথম মুখপত্র হিসেবে বের হলো। বিশেষভাবে পত্রিকার সম্পাদক ড. রিটা আশরাফকে ধন্যবাদ এই কঠিন কাজটির দায়িত্ব অত্যন্ত চমৎকারভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

পত্রিকাটির প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতা এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন ঃ কবীর চৌধুরী, ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, কবি আল মাহমুদ এবং ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। উলেখ্য ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ গত ১১, ০৭, ০৯ ইং তারিখে আমাদের ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের এই সব্যসাচী লেখককে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

পত্রিকাটির সম্পাদক ড. রিটা আশরাফ খুব যত্ন ও যোগ্যতার সঙ্গে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। পত্রিকাটির কাগজ এবং প্রচ্ছদ খুবই সুদৃশ্য। সূচিপত্রের ধারাক্রম লক্ষ্যযোগ্যঃ প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, অনুবাদ গল্প, নাটক, সাক্ষাৎকার, ফিচার এবং গ্রন্থালোচনা।

সম্পাদক ড. রিটা আশরাফ তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছেন যে, কোনো সাহিত্যিকের রচিত সাহিত্যকে ডান বা বাম ধারায় সমাহত করা সমীচিন নয়। জ্ঞান একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত প্রক্রিয়া। জ্ঞানতত্ত্বকে ডান ও বামে বিভাজিত করা উচিত নয়। তবে সভ্যতার বিকাশ স্বার্থে মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে ডান ও বাম উভয় মতাবলম্বীকেই গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে বিশ্বে একটি সুস্থিত সুন্দরতা বিরাজ করবে।

প্রথম সংখ্যার অতিথি লেখক হিসেবে দেশের বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ড.আশরাফ সিদ্দিকী 'বাংলার মুখ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির বিস্তার মৌলকেন্দ্র

হলো মানবতাবাদ। 'জগৎ ভরমিয়া' লেখক যে 'একই মায়ের পুত' সমস্ত বিশ্বময় দেখেছেন-সেই মৌলভাষ্যই তিনি প্রবন্ধটিতে প্রতিপাদিত করেছেন।

ড.তপন বাগচী 'কাজী মোতাহার হোসেনের নজরুল চর্চা, শীর্ষক প্রবন্ধে উলেখ করেছেন, নজরুলের সঙ্গে কাজী মোতাহারের ঘনিষ্ঠতার দিনগুলো তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অমূল্য সঞ্চয়।

প্রফেসর এস এম গাজিউর রহমান তাঁর 'ক্লাসিসিজম বনাম রোমান্টিসিজম' প্রবন্ধে লিখেছেন যে ক্ল্যাসিক্যাল রীতিতে অলংকরণের প্রাধান্য দেখা যায়; কিন্তু রোমান্টিক রীতিতে সহজ-সরল অনাড়ম্বর কথ্যভাষার লক্ষণ লক্ষ্যযোগ্য।

ড.সৈয়দা মোতাহেরা বানুর প্রবন্ধের নাম 'বিশ শতকের প্রথম চার দশকের বাংলা শিশুসাহিত্য'। বিশ্বের চিন্তার যুগকে তিনি চিন্তার আদিম যুগ, দার্শনিক চিন্তার যুগ এবং বৈজ্ঞানিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জীবনের সত্য লাভের একমাত্র উদ্দেশ্যকে তিনি জীবনকে পূর্ণ পরিণতি দানের দিকে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন।

মোঃ শাহাদাত হোসেন তাঁর 'লেখক ও সমাজ' প্রবন্ধে অবক্ষয়পূর্ণ লেখার বিপরীতে মূল্যবোধ সম্পন্ন রচনাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেখার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

খন্দকার আব্দুল মোমেন এর প্রবন্ধের নাম 'গৃহ পরিবেশ শিশুর ভবিষ্যৎ নির্মাণের অনিবার্য অনুষঙ্গ'। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে ইমারসনের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটিকে তিনি তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। উদ্ধৃতিটি হলো "শিশুকে সম্মান কর। অতিমাত্রায় মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব ফলাতে যেওনা। শেষ পর্যন্ত তাকে সম্মান দেখাও। কিন্তু নিজের সম্মানও বজায় রাখা তার চিন্তার সাথী, বন্ধুত্বের দোসর ও সদগুণের অনুরাগী হও। কিন্তু কোন ক্রমেই তার পাপের প্রশ্রয় দিও না।"

ড.আলাউদ্দিন আল আজাদ সব্যসাচী লেখক এজন্য যে, তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন, উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা-সর্বক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন। সব শাখাতেই সাফল্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর 'লাইট হাউজ' কবিতায় তিনি লিখেছেনঃ

"অমাবস্যাকে তুমি ঘৃণা করেছিলে এখন দেখছি তারও চাইতে অধিক অন্ধকার।"

কবি এই কবিতায় জীবন জটিলতার গভীর তল স্পর্শ করেছেন।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। তিনি তাঁর 'হে ফেব্রুয়ারী তুমি ফাল্গুন হও, কবিতায় বাঙ্গালি জাতি ও বাংলাদেশকে বিশ্বের মধ্যে যোগ্যতার সাথে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে প্রণোদিত করেছেন।

কবি প্রত্যয় জসীমের কবিতার নাম "সালাম আমাদের ভাষা মানব"। একুশের শহীদ সালামের গ্রাম সালাম নগর আজ বিশ্বগ্রাম। কারণ, মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সম্মানিত।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের 'ধারণা' গল্পে জীবনকে পুরুষ ও নারীর সমন্বিত স্বাভাবিকতায় যাপনের আনন্দ-অনুভবের আকাঙ্খা আছে।

রিটা আশরাফের গল্পের নাম "তূর্যকে লেখা মায়ের চিঠি"। সাহিত্য পাঠ মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে; তার চিন্তার পঙ্গুত্ব ঘোচায়-এহেন অনুধাবন গল্পটির চরিত্রে অনুসৃত আছে। গল্পটির যে দিকটি হৃদয় ছুঁয়ে যায় সেটি হলো মা ও সন্তানের শ্বাশত রূপ। এ চিত্র অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠ। মনে হয় প্রতিটি মানুষের জীবনের সঙ্গেই কোথাও না কোথাও যেন এটি এক হয়ে আছে।

ভাষা সৈনিক আবদুল গফুরের নেয়া সাক্ষাৎকারটি অত্যন্ত চমৎকার উপস্থাপনা। তাঁর কাছ থেকে ভাষা আন্দোলন এবং সাহিত্য সম্পর্কে যে সব তথ্য বের হয়ে এসেছে তা অমূল্য সম্পদ।

গ্রন্থালোচনায় ড. আবুল হাসান মুম্মদ সাদেক মহোদয়ের হিদায়াতুল কুরআন-১ম খন্ডের আলোচনা স্থান পেয়েছে। ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে বলে আমি কোরআন, হাদিস, বাইবেল, বেদ, গীতা, উপনিষদ-প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে থাকি। থিওলোজী পাঠে আমি দেখেছি, আলাহর একত্ববাদের ঘোষণায় আল কোরআন হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এক আলাহর সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষ সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও স্রষ্টাপ্রেমে নিবেদিত হোক-এই প্রণোদনা এই তাফসির গ্রন্থ আলোচনায় আমাকে প্রণোদিত করেছে। কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শ যে কত মানবিক, হৃদয়বাদী, ভ্রাতৃত্ব ব্যঞ্জক ও বৈশ্বিক চেতনাবাহী তা ড. সাদেক খুব যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর তাফসিরে প্রতিপাদিত করেছেন।

# মোঃ শফিউল আজম (মাহফুজ)

"এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ" এর সাহিত্য বিষয়ক মুখপত্র সাহিত্য পত্রিকা'টির প্রথম সংখ্যার জন্য প্রথমেই সম্পাদক ড. রিটা আশরাফ ও সংশিষ্ট সকলকে জানাই ধন্যবাদ। সুন্দর একটি প্রচ্ছদ উপহার দেওয়ার জন্য ফরীদি নুমানকেও শুভেচ্ছা।

আমি প্রথম সংখ্যাটি হাতে পেয়ে এর ঝকঝকে মুদ্রণ ও গুণগত মান দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পের পাশাপাশি নাটক, অনুবাদ গল্প, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির উপস্থাপনা সাহিত্য পত্রিকাটিকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। লেখার গুণগত মান কালোত্তীর্ণ না হলেও খুবই উঁচু মানসম্পন্ন হয়েছে। আশা করি এবং

বিশ্বাস করি সামনের সংখ্যাগুলো আরো বেশি মানসম্পন্ন হবে এবং বাংলাদেশের মূলধারার সাহিত্যকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে।

মুখপত্রটি নিয়মিত প্রকাশ করার যে প্রতিশ্রুতি সম্পাদক দিয়েছেন তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সংখ্যাটি সময়মতো বের করতে পারার জন্য আবারো ড. রিটা আশরাফকে ধন্যবাদ।

# সাদিয়া ফারজানা মোস্তাফিজ (উর্মি)

সভ্যতা বরাবরই সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলতে চায়। কালের প্রবাহে সফলও হয় বটে। তবে অনেক সময় মনে হয় এ প্রভাব একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ইতিবাচক নয়। আর তা হলো মানুষের আবেগিক বন্ধনের উপর প্রভাব। বিভিন্ন কাজকর্মে মেশিনের ব্যবহার করতে করতে আমরা যেন ক্রমেই নিজের অজান্তে মেশিনের মতো কাঠখোট্টা আর রসকসহীন হয়ে পড়ছি। আগেকার দিনে কথ্য ভাষায় যেমন সমৃদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যবহারের চলন ছিল এখন তা সেকেলে। আবার টি.ভি খুললেও নাটক, সিনেমার কথোপকথনে আগের দিনের সাথে বর্তমান সময়ের আবেগিক ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। সাহিত্য,উপন্যাসেও সুন্দর বাংলা ভাষার ব্যবহার অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। আপনজনদের আবেগ প্রকাশের একটি মাধ্যম যে চিঠি-মোবাইল, ই-মেইলের যুগে তাও যেন আমারা ভুলতে বসেছি।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার ১ম সংখ্যাটি খুবই আবেগ ভরে পাঠ করলাম। অত্যন্ত ছোটখাট কিছু ভুলত্রুটি ছাড়া নি:সন্দেহে খুবই সৃজনশীল মনোভাবাপন্ন একটি সুখ পাঠ্যকর পত্রিকা এটি। ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, সেলিনা হোসেন প্রমুখ দেশের প্রসিদ্ধ লেখকগণের লেখা পড়ে খুবই ভাল লেগেছে। আমি মনে করি, প্রতি সংখ্যায় অতিথি লেখকদের লেখা প্রকাশের বিষয়টি সম্পাদকের একটি অত্যন্ত চমৎকার সিদ্ধান্ত। কারণ, এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ লেখকগণ তাদের লেখার পাশাপাশি এই গুণীজনদের লেখা পাঠ করে নিজেদের লেখার ভুলত্রুটিগুলো খুব সহজেই ধরতে পারবেন এবং লেখার মান উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন খুব সহজেই। এই বিষয়টির জন্য আমি বিশেষভাবে পত্রিকার সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই। কবি আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেকের "হে ফেব্রুয়ারী তুমি ফাল্গুন হও" কবিতাটি যেন বাংলা মায়ের প্রাণের কথা। বাঙ্গালীর হৃদয়ের শ্বাশত অনুভূতি এতে প্রকাশমান। পত্রিকার যে লেখাটি আমার চোখ থেকে কান্না ঝড়িয়েছে সেটি একটি গল্প। গল্পের নাম "তুর্যকে লেখা মায়ের চিঠি"।

ড. রিটা আশরাফের লেখা "তুর্যকে লেখা মায়ের চিঠি" গল্পটিতে সেই মুমূর্ষ সংস্কৃতির আবেদন পাঠক হৃদয়ে আবার জাগ্রত করতে সক্ষম বলে আমার মনে

হয়েছে। পাঠক হিসেবে এ চিঠি আমাকে দুই প্রজন্মের মাঝামাঝি অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। মনে হচ্ছে আমার মায়ের কথা। তিনি হঠাৎ করেই খুব বেশি অসুস্থ্য হয়ে পরেন। তখন আমারও নতুন চাকুরি, ট্রেনিং এর প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে যাওয়া, আড়াই বছর বয়সী আমার প্রথম সন্তানের লালন-পালন সমস্ত ব্যস্ততাই যেন একসাথে। তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হতো চোখের ভাষায় তিনি যেন বলছেন, "সব কিছু ছেড়ে চলে আয় শুধু মায়ের মেয়ে হয়ে।"

এখন মনে হচ্ছে, তূর্যের মা যেমন চিঠির ভাষায় ছেলেকে তার আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেছিল, আমার অসুস্থ মাও হয়তো তেমনি বিছানায় শুয়ে চোখের ভাষায় আমাকে তেমনি অনেক কিছু বলতেন। আমিও তখন ঠিক করেছিলাম ট্রেনিং শেষ করে যখন আবার অফিসে জয়েন করবো তখন ছুটি নিয়ে মাকে সময় দেব। কিন্তু তার আগেই তিনি চলে যান।

এখনও ব্যস্ততা কম নয়। দুই সন্তানের লালন-পালন, চাকুরী-সব কিছু নিয়ে মনে হয়, আমার জন্য আমি নই, আমি যেন প্রতিষ্ঠানের আর আমার পরিবারের। কিন্তু তূর্যকে লেখা মায়ের চিঠি পড়ে মনে হয়েছে এ যেন আমার ভবিষ্যতের রূপচ্ছবি। এখন ব্যস্ততার কারণে চিঠি লিখার সময় হয়ে উঠে না। কিন্তু যখন জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হব, ব্যস্ততাও কমে আসবে, তখন নিশ্চয়ই তূর্যের মায়ের মতই এখনকার দিনগুলো স্মৃতির পাতায় আবেগের ভাষা মাখিয়ে লিখতে ইচ্ছে করবে। ইন্টারনেট, মোবাইল দূরের মানুষকে যতই সহজলভ্য করুক না কেন, যা আবেগের কথা মুখে প্রকাশ করা যায় না, তা আপনজনকে লিখে জানানোর আবেদন থেকেই যাবে।

আর তাই তূর্যকে লেখা মায়ের চিঠি যেন আমার পূর্ব পুরুষের আত্মকথা, আমারই ভবিষ্যতের প্রতিবিম্ব। আমার ধারণা, আমার মতো প্রতিটি পাঠকই "তূর্যকে লেখা মায়ের চিঠি" পড়ার পর নিজেকে এর মধ্যে খুঁজে পাবেন। এ ধরনের একটি বাস্ত বধর্মী জীবনগাথা আবেগিক ভাষায় ফুটিয়ে তোলার জন্য আমি এ চিঠির লেখিকাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

# সৈয়দ সাইফুল ইসলাম
# রবীন্দ্রনাথের পজিটিভ বিশ্বাসের জগত

প্রকাশকঃ সূচিপত্র, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকালঃ ২০০৮
পৃষ্ঠাঃ ১৫১, মূল্যঃ ১৫০।

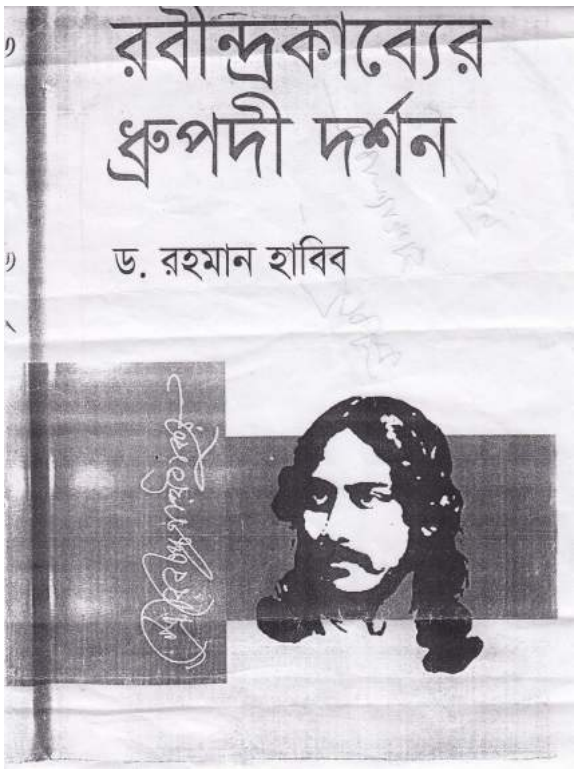


বৈচিত্র্য পিপাসু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনসত্যের অনুসন্ধানে সময়ের প্রয়োজনে ভবের ঘাটে ঘাটে তাঁর ভাব-তরণী ভাসিয়েছেন। তাই দেখি কখনও তিনি সাম্যবাদী চেতনার ঘাটে, কখনও বিশ্ব সৌন্দর্যের লীলাময় সত্তার (স্রষ্টা) ঘাটে তরী ভিড়িয়েছেন। অবশ্য একথাও সত্য যে, তিনি মার্কসবাদকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। কিন্তু রাশিয়ার সকল মানুষের প্রভূত উন্নতিতে তিনি আত্মহারা হয়েছেন। তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে এর প্রমাণ পাই। তিনি বারবার সৌন্দর্য চেতনার সাম্যবাদ ঘাটে তরী ভিড়িয়েও ঈশ-উপনিষদের সেই উক্তির প্রতি আনুগত্যও বজায় রেখেছেন আমৃত্যু। 'পরম সত্যের মুখ হিরন্ময় পাত্র দ্বারা আবৃত' একারণেই বিশ্বকবি তাঁর 'ছিন্নপত্রে' বলেছেন, 'কবিতায় কখনও মিথ্যে কথা বলিনে-সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান'। যাই হোক, তিনি 'এসব কিছু' করেছেন শুধুমাত্র নিজের ও নিজের চারপাশে সত্য বলে যা কিছু আছে সেসব কিছুর মানে খুঁজতে, অর্থবোধকতার অন্বেষণ করতে, অর্থময়তা গড়ে তোলার আয়োজনে যেখানে প্রতি পরতে 'অন্বেষণ' অর্থবোধকতার নতুন এলাকা সচেতন, অনায়াসে যেখানে গন্তব্য। মোটকথা বিশ্বকবির সাহিত্য সাধনার মূল কথাই হচ্ছে, জীবন সত্যের আসল সম্পর্ক সূত্র খুঁজে বের করার তোড়জোড়। যে কাজটি পৃথিবীর সকল প্রান্তের কবিরা করে থাকেন।

এ কথাগুলো বলছি রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী দর্শন প্রসঙ্গে। এখানে এ আলোচনায় 'ধ্রুপদী দর্শন' বলতে কবির আস্তিক্যচেতনা, ঈশ্বর বিশ্বাস, ভাববাদ এবং পজিটিভ

দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তিকেই বোঝানো হচ্ছে। আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন অধ্যাপক ড. রহমান হাবিব। যার পরিচয় একাধারে সাহিত্য সমালোচক, গবেষক ও তরুণ শিক্ষাবিদ হিসেবে। সম্প্রতি তিনি লিখেছেন আস্তিক্যদর্শন বিষয়ক গ্রন্থ 'রবীন্দ্রকাব্যের ধ্রুপদী দর্শন'। আলোচ্য গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক বিষয়টিই হচ্ছে মূলত রবীন্দ্রকাব্যে একদিকে বস্তুবিশ্ব যেমন উপস্থাপিত অন্যদিকে তেমনি বিশ্ব স্রষ্টার প্রতি প্রবলতম নিবেদিত চিত্ততার রোধ ও তাঁর কবিতাকে অনন্য সাধারণ মাত্রা দান করেছে। যে কারণে এই গ্রন্থে লেখক ড. হাবিব রবীন্দ্র কাব্যের বক্তব্যের ভেতরে প্রবেশ করে কবিতাগুলোর দার্শনিক মর্মার্থসার জীবন বোধের সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন ধর্মীভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য কবিতার আলোচনায় লেখক অবলম্বন করেছেন ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও বিচার ক্ষমতা।

যারা রবীন্দ্রভাবনার অতলান্তে পৌঁছেছেন, যতারা ওটুকু জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাম্যবাদী চেতনা কাজ করেছে সত্য কিন্তু তা মার্কস কিংবা লেনিনের সমাজতন্ত্র নয়। আবার এও সত্য যে, তিনি সরাসরিই অস্বীকার করেছেন মার্কসীয় মতবাদের ঐতিহাসিক গতিধারা ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্বরূপকে, তাহলে বিশ্বকবির পজিটিভ বিশ্বাসের জগত কোনটি? অর্থাৎ তাঁর জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান' কোনটি? আর তাই-ই নির্ণয় করেছেন ড. রহমান হাবিব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে-সূক্ষ্মতর ভাব-জগতে অনুপ্রবেশ করে। আলোচ্যগ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন, বিশ্বকবি কোন কোন কবিতায় নিষেক করে প্রস্ফটিত করেছেন স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ে বিবেচনের অভিমুখ। সব অপার্থিব শিল্পের (আধ্যাত্মিক) বিবেচন যে অর্থে নিহিতার্থ। লেখকের ভাষ্যমতে, 'রবীন্দ্রনাথ সেই মহান শিল্পস্রষ্টা; যিনি চিত্র শিল্পসহ তাঁর অন্যান্য সাহিত্য-আঙ্গিক-সমেত তাঁর কবিতার মধ্যেও জীবন ও জীবনোত্তর পর্বের কর্ম, চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং মন্নয়তাকে ভাব ও বস্তুবাদী-উভয় দর্শনের আত্মীকৃত মর্মার্থসারের নিরিখে জীবনকে ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী নিশ্চয়তায় বির্নিমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন'

রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু ছিলেন আস্তিক্যবাদী। পরম ব্রহ্মের চিন্তা কোনদিনই তাঁর মন-মস্তিক থেকে মুছে যায় নি। কথিত আছে মুসলমান সুফি সাধকদের প্রভাবও ছিল ঠাকুর পরিবারে। তাই দেখি ইসলামী সুফিবাদের 'নিজেকে চিনলে আলাহকে চেনা যায়' ভাষ্যের মৌল চৈতন্যগত গভীরতার অনুধ্যান 'প্রতিনিধি' কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে। এর দ্বারা রবীন্দ্র কাব্যদর্শনের ধ্রুপদীতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে লেখক মনে করেন। এ কবিতায় স্রষ্টাই যে কবির মাঝে 'আমি' হয়ে বিরাজিত আছে এটা বিশ্বকবি স্বীকারোক্তি দেন এভাবে, "যেন আমি বুঝি মনে, অতিশয় সংগোপনে তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ। আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো"। আবার অন্যত্র বলেছেন, "সীময় আকাশ' কাব্যে, 'সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর"। এ পঙক্তিদ্বয়ে অসীম

স্রষ্টা সসীম মানবদেহের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের সুর ঘোষণা করেছেন। এরই প্রেক্ষাপটে বিশ্বকবি মন্তব্য করেছেন যে, যেহেতু স্রষ্টার আলোতে কোন ছায়া নেই (আল কোরআনেও এর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে), তাই কবির মাঝে অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের মাঝে স্রষ্টা কায়ার রূপ ধারণ করেন। এভাবে বিশ্বকবি সীমার মাঝেও অসীম। যেভাবে স্রষ্টা মানব কল্যাণে যুক্ত থেকেও মুক্ত। আর এটাও রবীন্দ্র আধ্যাত্ম-চিন্তার একটা মৌল দিক বটে।

ড.হাবিব অত্যন্ত জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে এও প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনায় কবি দৃষ্টিভঙ্গির বিচার-বিশেষণে যুগপৎ দু'টি ধারা প্রবহমান। এক: সমাজতান্ত্রিক, দইু: পারত্রিক চেতনা তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের রহস্যময়তার ব্যাপারে বিশ্বাস সমাজতন্ত্রীরা বরাবর রবীন্দ্র বিশ্বাসের জগতকে বিভ্রান্তির বেঁড়াজালে আটকাতে সদা প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে লেখক বিশ্বকবির 'প্রথম দিনের সূর্য' এবং 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতাদ্বয়ের মর্মার্থসার নিয়ে জোড়ালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেখানে সাম্যবাদীরা তাঁকে (কবি) সংশয়বাদী বা ধর্মে অবিশ্বাসী বলে প্রচারণা চালাচ্ছে এখনো। লেখকের ভাষ্যমতে, বিশ্বকবির সর্বশেষ কবিতা 'তোমার সৃষ্টির পথ' তিনি লিখেছেন। স্রষ্টাকে উদ্দেশ্য করে (মৃত্যুর একদিন আগে)। 'তোমার জোতিষ্কতারে/যেপথ দেখায়/সে যে তার অন্তরের পথ,/সে যে চির স্বচ্ছ,/সহজ বিশ্বাসে সে যে/ করে তারে চির সমুজ্জল/বাহিরে কুটিল সে যে অন্তরে সে যে ঋজু/এই নিয়ে তাহার গৌরব'। আলোচ্য এই পঙক্তিগুলোতেই প্রকাশিত হয়েছে 'ছলনা ও প্রবঞ্চনাকে সহ্য করে অন্তরকে ঋজু রাখার মধ্য দিয়ে, সহজ বিশ্বাসকে অটুট রেখে অন্তরের পথের অনুধ্যানের রাস্তা দিয়েই যে সত্য তথা স্রষ্টাকে অনুধাবন করা সম্ভব-সে অনিবার্য শাশ্বত দার্শনিক সত্যকেই কবি এই কবিতায় প্রবল গভীর আত্মময়তার প্রাজ্ঞতায় প্রাতিস্বিক প্রতিভার শক্তিতে মৌলিক বিশ্বাসের ধ্রুপদী নিশ্চয়তায় উপস্থপন করতে সমর্থ হয়েছেন'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পজিটিভ বিশ্বাসের জগতকে ইঙ্গিত করে এও বলেছেন, 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম-/সে কখনো করেনা বঞ্চনা'। লেখক এ বইয়ের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত উক্ত আলোচ্য দিককে জোরে সোরে, দৃঢ়তার সাথে বলে গেছেন একের পর এক যুক্তির জাল বিস্তার করে।

এই বইয়ের সার্বিক বিশেষণে না গিয়ে এটুকু বলা যায় যে, একটা পজিটিভ বিশ্বাসের ওপর ভর করে বিশ্ব কবি অন্য সকলের মতো অগ্রসর হয়েছেন। তাই চূড়ান্ত বিচারে একটা পজিটিভ বিশ্বাস তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। শব্দ, ছন্দ, সুরে কবি আত্ম প্রত্যয়কে বুনন করেছেন। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন আত্মপ্রত্যয়ী, সিদ্ধ-সাধক এবং কালজয়ী কবি। এ কথাটিই বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রপ্রেমিক ড. রহমান হাবিব।

যে কথাটি না বললে বইটির লেখকের প্রতি অবিচার করা হে সে কথাটি হলো লেখক মন এখানে অনাবশ্যক বক্তব্যের ঠাসা বুননে ভারাক্রান্ত হয় নি। তাঁর বক্তব্যের বুননে

আছে বিশ্ব কবির ধর্মীয় ঐতিহ্যের লালিত্য। আবার এই বইয়ে কবির কবিতার পঙক্তি নির্বাচনে এবং এর ব্যাখ্যা-বিশেষণে চমৎকার পরিমিতিবোধ লক্ষণীয় ও সরল গতিশীল গদ্যের মাধুর্যে যা গভীরভাবে আত্মপ্রত্যয়ী। আর পাঠ অভিজ্ঞতা পাঠকের চেতনায় একটা স্বতন্ত্র ভুবনের অনুপ্রেরণা রূপে উপস্থিত হয়। এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ তো গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথাটি উলেখ না করলেই নয়। তা হচ্ছে, যারা রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মতর ভাব-জগতে অনুপ্রবেশ করতে চান, যারা রবীন্দ্রনাথ কিভাবে লালন-দর্শনে অভিভূত হয়ে কবিতা লিখেছিলেন তা জানেন, যারা রবীন্দ্রকাব্যের দু'টি ধারার সময়কালের ব্যবধান সম্পর্কে জানেন, যাদের অন্তরে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি বিরাজমান তারাই 'রবীন্দ্রকাব্যের ধ্রুপদী দর্শন, গ্রন্থটির মর্মার্থসার অনুধাবন করতে পারবেন বলে লেখক মনে করেন।

# সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংবাদ

## কবি নির্মলেন্দু গুণের জেমকন সাহিত্য পুরস্কার ২০০৯ লাভ

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পথিকৃত কবি নির্মলেন্দু গুণ জেমকন সাহিত্য পুরস্কার ২০০৯ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। গত ২৮ জুন হোটেল শেরাটনে জেমকন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ এ পুরস্কার প্রদান করেন।

## ড. আলাউদ্দিন আল আজাদের ইন্তেকাল

বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক ড. আলাউদ্দিন আল-আজাদ গত ৪ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখে পরলোক গমন করেন। ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন। সাহিত্যের সকল শাখায় ছিল তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি সাহিত্য পত্রিকার উপদেষ্টা পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্যও ছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আমরা তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

**আলাউদ্দিন আল আজাদের মৃত্যুতে বিশেষ শোকবাণী**

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি সাহিত্য পত্রিকার উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ড. আলাউদ্দিন আল আজাদের মৃত্যুতে এইউবি'র মাননীয় উপাচার্য ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই সব্যসাচী লেখকের মৃত্যুতে দেশের সাহিত্যাঙ্গণের অপূরণীয় ক্ষতি হলো এবং জাতি একজন গুণী মানুষকে হারালো।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

স্যারের সাইন স্ক্যান করে বসাতে হবে।

**ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক**
উপাচার্য, এইউবি।

## কবি ও ছড়াকার আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক এর শিক্ষায় মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল-২০০৯ পদক লাভ

গত ১২ সেপ্টেম্বর ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাদার তেরেসা রিসার্চ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হন কবি ও ছড়াকার আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। তাঁর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী এম পি।

শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত বর্ণাঢ্য পরিচয়ের অধিকারী অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের ফিন্যান্স বিভাগে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষকতাজীবন শুরু করেন। অত:পর একই বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন, কানাডার ম্যানিওটোবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ ও পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন এবং পরবর্তীতে মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় অধ্যাপক ও ডীন হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন তিনি। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে এবং ডীন এবং সিনেট মেম্বার হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

উল্লেখ্য ড. সাদেক শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০০০-২০০১ সালের জন্য ক্যামব্রীজের ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিক্যাল সেন্টার থেকে "ম্যান অব দ্যা ইয়ার" নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ পুরস্কার লাভ করেন এবং ২০০৯ সালে স্বাধীনতা সংসদ সম্মাননায় ভূষিত হন।

ব্যক্তিজীবনেও ড. সাদেক মাদার তেরেসার কর্ম জীবনের অনুসারী। নিজ এলাকায় এবং ঢাকার আশুলিয়ায় তিনি অনাথদের জন্য একটি আশ্রম পরিচালনা করছেন সম্পূর্ণ নিজ খরচে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও মাননীয় উপাচার্য ড. সাদেক নিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে।

## মাহবুব আজাদ এর অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার-২০০৯ লাভ

লেখক, গবেষক মাহবুব আজাদ "আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ" জীবনী গ্রন্থ রচনার জন্য "!অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার-২০০৯" লাভ করেছেন।

# সাহিত্য পত্রিকা

## পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, গ্রন্থালোচনা সাহিত্য পত্রিকা সমালোচনাসহ সাহিত্য সংশ্লিষ্ট যে কোন ধরনের লেখা আমন্ত্রিত। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে।

- ⌘ লেখার সাথে ফোন নং সহ পূর্ণ ঠিকানা যুক্ত করতে হবে।
- ⌘ লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ ই ডিসেম্বর ২০১০।
- ⌘ প্রতি সংখ্যায় গদ্য এবং পদ্য সাহিত্যে দু'জন শ্রেষ্ঠ লেখককে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- ⌘ পরবর্তী সংখ্যার প্রকাশকালঃ জানুয়ারি ২০১০ ।

**লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ**

সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকা, বাড়ী ৯, সড়ক ৫, সেক্টর ৭,
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
ঊ-সধরষ : ংযধযরঃঃড়ঢ়ধঃৎরশধ@ধঁন-নফ.ড়ৎম
ডবনংরঃব: ীঁি.ধঁন-নফ.ড়ৎম/ংযধযরঃঃড়ঢ়ধঃৎরশধ./যঃসষ

# ঘোষণা

সাহিত্য পত্রিকা পরবর্তী সংখ্যার "সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংবাদ" বিভাগে প্রকাশের জন্য জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্ত পুরস্কার, সম্মাননা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থের ছবি ও প্রকাশিত ২ কপি গ্রন্থসহ সাহিত্য পত্রিকা অফিসে প্রেরণের জন্য সম্মানিত লেখক ও পুরস্কার প্রাপ্তদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

**ড. রিটা আশরাফ**
সম্পাদক
সাহিত্য পত্রিকা, এ ইউ বি।